বুটিক চা-আড্ডায় বাড়ছে কি তরাই-ডুয়ার্স চায়ের গ্ল্যামার ?

ইকো টুরিজমের পথটি আজও বেশ গোলমেলে

ভূত রাজার দেশ ডালিমটার

কেন কোচবিহার মেল নয় ?

এখন ডুয়ার্স

মার্চ ২০১৮। ১২ টাকা

স্বাগতম

জলপাইগুড়ি পুরবাসীর জন্য উপহার

হাউসিং ফর অল (এইচ.এফ.এ)

• ২০১৫-১৬ আর্থিক বছরে ১২৯০টি গৃহ, ৩ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা (প্রতিটি গৃহের মূল্য) মূল্যের পাকা ছাদযুক্ত বাড়ি প্রদান করা হয়েছে।

• ২১০৬-১৭ আর্থিক বছরে ১৯৪৫টি পাকা ছাদযুক্ত বাড়ি প্রদান করা হবে।

জলপাইগুড়ি পৌরসভা

শ্রীমতী পাপিয়া পাল
উপ-পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

শ্রী মোহন বোস
পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

এখন ডুয়ার্সের প্রকাশিত নতুন বই

৫৫ টাকায় পকেট নভেল

অন্ধকারে মৃত্যু-আলিঙ্গন। বিপুল দাস
মূল্য ৫৫ টাকা

মেঘের পর রোদ। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য
মূল্য ৫৫ টাকা

৩৬৫ কবিতার ডায়েরি

পঞ্চাশ পর্যটন শেষে মাধুকরী ধান। অমিত কুমার দে।
মূল্য ২৫০ টাকা

প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন। তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস, মূল্য ১১০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি - বিশ্বাস বুক এজেন্সি, বাটা গলি, হিলকার্ট রোড, **ইকনমি বুক স্টোর**, কলেজ পাড়া।
জলপাইগুড়ি - আড্ডাঘর, মার্চেন্ট রোড
গ্রন্থভারতী, ডিবিসি রোড।
আলিপুরদুয়ার - শ্যামলী বুক ডিপো।
কোচবিহার - আরতি ঘোষ ম্যাগাজিন স্টল, কাচারিমোড়।

ছোটদের জন্য প্রথম বইটি

সবুজ মনের গল্পগুলি। রীতা রায়। মূল্য ১২৫ টাকা

পুরোটা এখন বই আকারে

লাল চন্দন নীল ছবি। শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। মূল্য ১১০ টাকা

এখন ডুয়ার্স-এর নতুন বই

ডুয়ার্সের গপ্পোসপ্পো

সা গ রি কা রা য়

এক মায়াময় জগত ডুয়ার্স, যার সঙ্গে লেখিকার নাড়ীর বন্ধন। প্রতিটি নিঃশ্বাসের সঙ্গেই তাঁর চেতনার রঙে জারিত হয়ে ফুটে ওঠে ডুয়ার্সের নানা চিত্রকল্প। কলকাতার একটি বড় দৈনিকের রবিবারের পাতায় একসময় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়া চৌত্রিশটি গল্পের সংকলন। প্রকাশিত হল। **দাম ১৫০ টাকা**।

প্রকাশিত হতেই সাফল্য

চায়ের ডুয়ার্স কী চায়?
গৌতম চক্রবর্তী

গত এক বছরে ডুয়ার্সের চা-শিল্পের পরিস্থিতি, উত্থান-পতন, সুখ-দুঃখ, সরেজমিনে বাগান ধরে ধরে ঘুরে দেখে তা ধারাবাহিক আকারে প্রকাশিত হয়েছে পত্রিকার পাতায়। অবনতির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণগুলি যেমন ধরা পড়েছে, সেই সঙ্গে চায়ের দূরবস্থার সুযোগ নিয়ে গড়ে উঠছে যে বিশাল মাফিয়া চক্র, তারও ইঙ্গিত মিলেছে বহু জায়গায়। এই সংকলনে ধরা পড়েছে এক অবিশ্বাস্য যুগ। অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল হিসেবে এই বইটি সাড়া জাগাবে কোনও সন্দেহ নেই। **১১০ টাকা**

ডুয়ার্স থেকে দিল্লি
দেবপ্রসাদ রায়

রাজনীতির চর্চার পটভূমি একদিন বদলে গেল। পরিস্থিতির চক্রে ডুয়ার্স থেকে দিল্লিতে পৌঁছে গেলেন। ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়লেন জাতীয় রাজনীতির আঙিনায়। সঞ্জয় গান্ধী হয়ে ইন্দিরা গান্ধী, তারপর রাজীব গান্ধীর বিশ্বস্ত সহচর হয়ে উঠেছিলেন তিনি। দলের হয়ে দেশের নানা প্রান্তে কাটাবার অভিজ্ঞতা হল, পৃথিবীর নানা দেশে যাওয়ার সুযোগও। দীর্ঘ ২৬ বছরের উত্তরবাংলা, কলকাতা হয়ে দিল্লি তথা গোটা দেশের রাজনীতির ছবি ধরা পড়েছে জনপ্রিয় নেতার কলমে। **১৫০ টাকা**

পাওয়া যাচ্ছে: কলকাতা - দেজ পাবলিশিং ও অক্সফোর্ড। জলপাইগুড়ি - আড্ডাঘর, মার্চেন্ট রোড

সম্পাদকের ডুয়ার্স

সব সৌজন্যে আসাম!

এয়ারপোর্ট ফিরতি জয়গাঁর ভাড়া করা গাড়ির ড্রাইভারটি সেদিন এক 'বিগ স্টোরির' সন্ধান দিল বটে! এখন শিলিগুড়ি-ডুয়ার্স-হিলে না গিয়ে আসাম লাইনে গাড়ি চালানো নাকি অনেক বেশি নিরাপদ ও লাভজনক। কারণ আসামে রাস্তা এখন 'এ-ওয়ান', আর নেই সেই পুলিশি জুলুম। সেখানে পুলিশের ব্যবহার নাকি এখন অবাক করা মোলায়েম সহযোগীর মতই, উপরন্তু নাকি আশ্বাস দেয়, যেখানেই পুলিশ দেখবে, ভাববে তুমি সুরক্ষিত!

এ কি ছিলিমের কান্ড রে বাবা? আসামে রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠার ফল এত দ্রুত মিলে গেল? আর এতটা কাছে থেকেও টেরই পেলাম না? সরেজমিনে দেখবার ফুরসৎ কবে মিলবে তাও জানি না! অতএব গুগল ঘেঁটে দেখলেই হয়! ঠিক তাই। আসলে মোদিজির অ্যাক্ট ইস্ট নীতির ঝোড়ো রূপায়ণ চলেছে। আসাম হয়ে নর্থ-ইস্ট হতে চলেছে সাউথ-ইস্ট এশিয়ার সঙ্গে নিবিড় বন্ধুত্ব করবার নতুন গেটওয়ে। শক্তি-সমৃদ্ধি -নিরাপত্তার জন্য এবার নিজের মহাদেশের প্রতিবেশীদের উপর বেশি আস্থা রাখতে চাইছি আমরা! পথঘাট-প্রশাসনে তাই এই দ্রুতগামী সংস্কার, সম্ভবত, আর তারই হাতে গরম সুবিধে মিলছে সীমানার এপারের গাড়িচালকদের। (এপারে অবশ্য পুরনো চিত্রই বহাল, পথ সামলাচ্ছে সিভিক পুলিশ, বলতে হবে বেশ 'শক্ত' হাতেই।)

আসামের মানুষেরা অবশ্য সেই সুযোগ পেতে শুরু করেছে কি না জানা নেই, তবে ডুয়ার্সের আমরা কিন্তু বেশ বুঝতে পারছি তার সুফল। রাস্তা-রেলপথ-সেতু নির্মানে যে গতি এসেছে তা আগে কখনও দেখিনি। এই সুযোগে কোচবিহারও উড়ান প্রকল্পের তালিকায় উপরের সারিতে উঠে এসেছে, বিমান চালু এবার কিছু সময়ের অপেক্ষা। আর কোচবিহার থেকে বিমান পরিষেবা হলে যে পিছিয়ে থাকা নিম্ন আসামের সঙ্গে যোগাযোগের গতি বাড়বে তা আজ আর আলাদা করে বলবার নয়। তেমনই তার পুরো 'বেনিফিট' পাবে ডুয়ার্স অঞ্চল, সে নিয়েও কোনও সন্দেহ নেই! বাগডোগরা-কোচবিহার-পাকইয়াং এই তিন মিলে ইকো-টুরিজমের এক আধুনিক সার্কিট গড়ে ওঠার সম্ভাবনা অতি প্রবল।

নিন্দুকেরা ব্যাখ্যা করবেন, এসব হল আসলে গেরুয়া সাম্রাজ্য বিস্তারের নানান সুপরিকল্পিত চাল। কিংবা চিনের মাস্তানি রুখবার ব্যয়বহুল প্রস্তুতি। অথবা বণিক সম্প্রদায়কে শোষণের নতুন কেন্দ্র তৈরি করে দেওয়ার মাখনে-ঢাকা-ষড়যন্ত্র। ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা বলব, বেশ তো তা হোক না! এতে যদি ডুয়ার্সের বুকের উপর থেকে প্রাচীন জগদ্দল পাথরটা সরে যায়, যদি কোচবিহার থেকে এক বাসে পৌঁছে যাওয়া যায় রেঙ্গুন কিংবা এক বিমানে চেপে পৌঁছে যাওয়া যায় দেশের রাজধানীতে, তবে তার জন্য অনেক অসৎ অভিলাষ মেনে নেওয়া যেতে পারে। আসামের কল্যাণে আমাদের এই উত্তরের হতভাগ্য ভুমি যদি খানিক সুখে থাকে, পুত্রকন্যাদের বিভুঁয়ে পাঠিয়ে যদি খানিক স্বস্তিতে থাকে, তবে সেই আসামের জয়গান গাইতে বাধা কোথায়? গত বাহাত্তর বছরে আমাদের কোনও ত্রাতা-বিধাতা-নেতা জোটেনি, বড়ই অভাগা গো আমরা! সম্প্রতি আগরতলার ট্রেন চালু হওয়ায় ডুয়ার্সের পরিমণ্ডলে কী কী বদল ঘটে গিয়েছে সে সব কাহিনি পরবর্তীতে আসবে। পাঠক ইতিমধ্যে তা বরং অনুধাবন করার চেষ্টা করুন।

চতুর্থ বর্ষ, ১৯ সংখ্যা,
মার্চ ২০১৮

এই সংখ্যায়

সম্পাদকের ডুয়ার্স ৫

তরাই-ডুয়ার্স পরিক্রমা
দেবী চৌধুরানি মন্দির ১০

উত্তরপক্ষ
সার্কিট বেঞ্চ জলপাইগুড়ি ১৫০-এ উপহার! ২০

প্রচ্ছদ নিবন্ধ
বুটিক চায়ের আড্ডায় ফিরছে কি তরাই-ডুয়ার্সের গ্ল্যামার? ২২
টপ টি হাউস ২৫
'টি মোমেন্টস' ২৭
আড্ডাঘর পেরোল দুটো বছর ২৮

পাহাড় পর্ব
ইকো টুরিজমের পথ এখনও গোলমেলে ৩১

পর্যটন
ডালিম টার ২৯

শ্রীমতি ডুয়ার্স
আনন্দমেলা ৩৪
ডুয়ার্সের ডিশ ৩৪

ডুয়ার্স আমার মাতৃভূমি
সীমান্তরেখার কাছে ৩৬

ধারাবাহিক ডুয়ার্স
ডুয়ার্স থেকে শুরু ৩৭
শালবনে রক্তের দাগ ৪৪
তরাই উৎরাই ৪৯
ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস ৫৬

নিয়মিত বিভাগ
খুচরো ডুয়ার্স ৬
ডুয়ার্সের চা-বাগান চিনুন ১৪
কোচবিহার চর্চা ৪১
ডুয়ার্সের ডায়েরি ৪২
ডুয়ার্সের হেথা হোথা ৫৩

প্রচ্ছদ ছবি: অভিষেক দাস (টি মোমেন্টস মালবাজার)

সম্পাদনা ও প্রকাশনা প্রদোষ রঞ্জন সাহা
ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান শুভ্র চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদনা শ্বেতা সরখেল
অলংকরণ শান্তনু সরকার
সার্কুলেশন দেবজ্যোতি কর, দিলীপ বড়ুয়া
ইমেল ekhonduars@yahoo.com
মুদ্রণ অ্যালবাট্রস

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস
মুক্তা ভবনের দোতলায়।
মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি
ফোন ০৩৫৬১-২২২১১৭

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে।
এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

খুচরো ডুয়ার্স

জ্ঞানের আলো

মহকুমা লাইব্রেরিতে নিখরচায় সদস্যা হতে গিয়ে অভূতপূর্ব আলোক প্রাপ্ত হয়েছেন জনা পঞ্চাশেক ছাত্রী এবং, কী বিচ্ছিরি ব্যাপার, অতিরিক্ত জেলা শাসকও! কথা ছিল 'কন্যাসাথী'র অঙ্গ হিসেবে কন্যাদের দেওয়া হবে গ্রন্থাগারের সদস্য পদ। তা সেই উপলক্ষ্যে লাইব্রেরি আলোয় আলোয় ঝলমল। ঘর মোটেই বড়ো নয় তো কী হয়েছে! জ্বেলে দেওয়া হয়েছে সোডিয়াম ভেপার। এক্কেবারে চোখের ডগায় বলা চলে। জ্ঞানরূপী ভেপারের আলোয় মুগ্ধ বালিকারা বাড়ি ফিরে দেখল চোখ লাল হয়ে জ্বলছে! না না! জ্ঞানের আলোয় জ্বলছে না! লঙ্কা লাগলে যেমন জ্বলে, তেমন ধারা অনেকটা। এডিশনাল শাসকের চোখও। পরে জানা গেল যে, চোখের সামনে আলোর বাঁধ ভেঙে যাওয়ার কারণেই এই ভোগান্তি। ছোট ঘরে আলো উপচে গিয়ে চোখে ঢুকে গেছে! তা ভালো! ভাগ্যিস বক্তৃতা শোনাবার জন্য মুখের সামনে একটা পিলারাকৃতির সাউন্ড বক্স বসিয়ে দেয়নি! নিন্দুকেরা কেন জানি বলছে, লাইব্রেরিতে কন্যেরা যাতে দ্বিতীয়বার না আসে, সে জন্যই এসব অনাসৃষ্টির আয়োজন।

কাজিদের শপথ

'মিঞা বিবি রাজি তো ক্যায়া করেগা কাজি' বললে আর মানতে রাজি নন ধূপগুড়ির কাজিরা। মানে পুরোহিত, কাজি, যাজকেরা। অধিকাংশ গান্ধর্ব বিবাহ এদের হাত ধরেই নিঃশব্দে ঘটে যায়। কিন্তু এবার বয়সের প্রমাণ না দিলে কাজি আর রাজি হবে না। এই সেদিন এক মঞ্চে হাজির হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা। বাল্যবিবাহ যাতে একেবারেই থেমে যায়, তার জন্য প্রচার চালাবেন। বিজ্ঞ জনের মতে, আশু ভ্যালেন্টাইন দিবসের আগে এই সিদ্ধান্ত খুব কাজে দেবে। সংশয়বাদীদের মতে, বার্থ সার্টিফিকেট জাল করা কী এমন ব্যাপার! বিয়ের জন্য লোকে কী না করতে পারে! তাই তো!

পথের ফাটা সাথী

বীরপাড়াতে 'পথের সাথী' গোত্রের টুরিস্টবাস চালু করে গম্মেন্ট চেয়েছিল সেখানে রাত কাটিয়ে লোকজন ইতিউতি ঘুরে বেড়াতে পারবে। দিদি এসে উদ্বোধনও করে গিয়েছিলেন মাত্র বছর দেড়েক আগে। তারপর থেকে পথের সাথী পথেই দাঁড়িয়ে। কেউ আসছে না তার কাছে। কী করে আসবে? বুক করা যায় না যে! তাই মোটে পনের মাস একা একা দাঁড়িয়ে থেকে সে এত্ত ক্লান্ত হয়ে গেছে যে অঙ্গে ফাটল গজিয়ে যাচ্ছে! অ্যাঁ! কী বলিস এ সব? মাত্তর পনের মাসে ফাটল? তা ভাই, মশলায় সিমেন্ট দিয়েছিল তো? গম্মেন্টের লোকজন বলছে যে, কে ভাড়া দেবে, সেই অতি জটিল, দীর্ঘ আলোচনাযোগ্য বিষয় জরুরী ভিত্তিতে আলোচনা করে মাত্র দেড় বছর সময় নিয়ে আমরা সিদ্ধান্তে এসেছি যে, অতঃপর উক্ত গোত্রের ভবনগুলি এসজেডিএ দেখভাল করবে। দেখা যাক, এবার রবিবাবু কী করেন!

হাতি ভাগানিয়া

ডুয়ার্সের হামলাবাজ হাতিদের জন্য কিঞ্চিৎ দুঃসংবাদ। তারা হামলা শুরু করলেই এবার বনবিভাগের হাতি ভাগান বিশেষজ্ঞদের অকুস্থলে পৌঁছে দেবার জন্য এসে গেছে এক জোড়া গাড়ি। সাইরেন লাগান সে গাড়িতে জোরাল সার্চ লাইট, জেনারেটর থাকবে। অত্যধিক বিচ্ছু হাতিদের ঘুম পাড়ানি গুলি ছুঁড়ে কাবু করার পর ঠান্ডা জলে স্নান করানর জন্য থাকবে জলের ট্যাঙ্ক। ধরার পর আচ্ছা করে বেঁধে নিয়ে যাওয়ার জন্য থাকবে চ্যাপ্টা দড়ি। এক কথায়, হামলা পটিয়স হাতিদের আরও সতর্ক থাকার মতো পরিস্থিতি! জোড়া হাতি ভাগানিয়া গাড়ির একটা বীরপাড়া গেছে, আরেকটা শুকনায়। পরিস্থিতির মোকাবিলায় হাতিরা জরুরী আলোচনায় বসেছে।

গোড়ায় বালি

ধরুন, দাঁতের গোড়া শক্ত করার জন্য আপনি বৈদিক মতে তৈরি টুথপেস্ট ব্যবহার করে দেখলেন, দাঁত পড়ে গেল! নিশ্চই চটে লাল হয়ে যাবেন। তা, দাঁত না হলেও ফসলের গোড়া শক্ত করার জন্য সার কিনে ছড়িয়েছিলেন রায়গঞ্জের বেশ কিছু চাষিভাই। ফল পেয়েছেন উল্টো! গোড়ায় ভেবেছিলেন, ভূতুড়ে ঘটনা। পরে টের পেলেন, সার ভেবে যেটা দিয়েছেন, সেটা পরীক্ষা করে দেখবেন। দেখতেই চমক! কোথায় ফসফেট সার! এ যে চাচা স্রেফ হলদে রং করা বালি গো! মানে, বালুকা! গন্ধের জন্য এটুখানি রাসায়নিক মিশিয়ে দেওয়া। এরপর আরও খোঁজ নিতে আরও চমক! সাররূপী বালুকার কারখানা যে গাঁয়ের মধ্যেই। এক হতচ্ছাড়া বাড়ির পেছনে কারখানা বানিয়ে দেদার বানাচ্ছে বালুকাসার! অতঃপর জোর তল্লাসি করে জানা যাচ্ছে আরও চমকদার সন্দেশ! নকল সার নাকি রমরমিয়ে বিক্রি হয় মার্কেটে। কী সব্বোনাশ!!

আহা গুরুং

কালিম্পং জেলা হয়ে যাচ্ছে। সে নিয়ে জোর মোচ্ছবের কথাও শোনা যাচ্ছে। পাহাড়ের মানুষ বেশ উত্তেজিত তা নিয়ে। কিন্তু গুরুংবাবুর মুখটি কেমন ভার ভার। গজমম-র নারী বাহিনী ছেড়ে সেদিনই গুচ্ছ গুচ্ছ সদস্যা হাসিমুখ করে দিদির খাতায় নাম লিখিয়ে ভারি নেচে বেড়াচ্ছে চারদিকে। 'গোর্খাল্যান্ড' নিয়ে হুংকারযুক্ত আন্দোলনের কথা বললেও পাব্লিক ফিরে তাকাচ্ছে না। ওদিকে দ্যাখো! হরকাবাবুর মুখে হাসি আঁটছে না! দিদির বাহাদুর ভাই-এর মতো মহা ফুর্তি নিয়ে ঘাসফুলে জল দিচ্ছেন। এরপর কি গুরুংবাবুর রাতে শান্তিতে ঘুম আসে গো? হতচ্ছাড়া হরকা! খামোক বলে দিলে যে আলাদা রাজ্যের আর দরকার হচ্ছে না? এইবার দেখিস! গোর্খাল্যান্ড আদায় করার জন্য কী করি! একটু ভাবতে দে কেবল!

ফেস বকুনি

বউ জানত যে বর কিশানগঞ্জের বান্ধবীর সঙ্গে খুব ফেসবুক করে! তা ফেসবুক বলেই বউ চুপচাপ ছিল। কিন্তু সে মেয়ে যে বরের সঙ্গে দেখা করার জন্য বাড়িতে চলে আসবে, তা কে জানত? তাই যেদিন দেখল বরের টানে মেয়ে এসেছে বাড়ির চৌকাঠে, ওমনি ফর্মে ফিরলেন বউ। বান্ধবীর ফেস-এ চমৎকার স্বাগত চপেটাঘাত করলেন প্রথমে। তারপর যাকে বলে রীতিমত ধোলাই প্রদান! বেচারা বান্ধবী তিন লাফে কিশানগঞ্জ ফিরতে পারলে বাঁচে। বর যতই বলে, আরে! এ আমার স্রেফ বান্ধবী, বউ ততই ঘুঁসোয়! বলে, ফেসবুক থেকে মুখ দেখাতে বাড়ির দরজায় কেন বাপু? বান্ধবী তো

ফেসবুকে প্রোফাইল পিকচার দেখাও। রিয়েলে দেখাচ্ছ কোন আক্কেলে? তা, পরে নাকি পুলিশ এসে সামলেছে! যাক! উত্তর দিনাজপুরের কান্ড। চাকুলিয়ায়।

শিশুর জুয়া

শিশুবাড়িতে জুয়ারিদের দাপটই আলাদা। তাঁরা পুলিশকে ফোন করে বলে, সার! আমাকে জুয়ার বোর্ড লাগাতে দিচ্ছে না। তাঁদের নামে বাস স্টপের নামকরণ হয়। প্রতিবাদ করলে এলাকা ছারা করে দেয় পরদিনই। কেউ কেউ থানায় এজাহার লেখাতে নাকি গিয়েছিলেন সাহস করে। পুলিশ পত্রপাঠ ফিরিয়ে দিয়েছে। অনুসন্ধান চালিয়ে জানা গেল, সেখানকার হাটে জুয়া কারবারীদের মৌরসী পাট্টা। সে গম্মেন্টের আমলেও চলত, এ গম্মেন্টের আমলেও চলছে। এমন সব বাঘা বাঘা লোক জড়িত যে অভিযোগ পেলে পুলিশ সিলিং ফ্যানের দিকে তাকিয়ে থাকে। অবশ্যি, গম্মেন্টের দলের লোকেরা বলছে, হাটে জুয়া খেলা হলেও আমরা চালাই নে কো। কী কান্ড ভাবুন দিকি কাকা! নিজে চালাস না, ভালো কথা! তা বলে অন্যেরা চালালে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবি? তোরা না শাসক? নিজেরাই খেলছিস না তো?

বাপ রে

পয়লা জানুয়ারি পিকনিক হবে। চমৎকার পরিবেশে মাংস কিনে পিকনিক স্পটের দিকে যাচ্ছিলেন গোপালপুর চা বাগানের দুই শ্রমিক। এমন সময় আক্রমণ! ছিনতাই হয়ে গেল হাতে ঝোলান মাংসের প্যাকেট! কব্জিতে ক্ষত নিয়ে পালিয়ে বাঁচলেন দু'জন। সাধের পিকনিক লাটে! কিন্তু অভিযোগ জানাবার উপায় নেই যে! যে ব্যাটা মাংস ছিনতাই করে ভেগেছে, সে এক চিতাবাঘ! ক-দিন ধরেই তল্লাটে চুরি ছিনতাই করে বেড়াচ্ছিল। শেষে পিকনিকের মাংস ছিনতাই করার পর বন দপ্তর বিস্তর ঘাম ঝরিয়ে তাকে একখানা ঘুম পাড়ানি গুলি খাইয়ে দিয়ে বাগে এনেছে। এই তো সেদিন ডুয়ার্সের কোথায় জানি বিয়ে বাড়ির খাবার ছিনতাই করে পালিয়েছিল হাতিরা। এবার পিকনিকে হানা চিতার!! বাপ রে! ডুয়ার্স বুঝি বুনোরাই নিয়ে নেবে রে!!

পুলিশের দু আঙুল

বীরপাড়ায় এ কি গোলমেলে ঘটনা! কলেজ নির্বাচনে নিয়ম মত শাসক দল জিতে গেছে। হৈ হৈ করে মিছিল চলছে পথ বেয়ে। পড়ুয়ারা দু-আঙুল তুলে ভি চিহ্ন দেখিয়ে জয় পালন করতে করতে চলছে। ছবিও উঠছে টপাটপ। নিমেষে চলে যাচ্ছে সোশাল মিডিয়ায়। দুমদাম লাইক! হেনকালে এক ছবি দেখে পাব্লিক থ! আরে এ কি! ছাত্রছাত্রীদের পেছেন আঙুল তুলে ভি দেখাতে দেখাতে ওটা কে হাঁটছে? এ তো পুলিশ! সঙ্গে সঙ্গে প্রবল চেঁচামেচি! পুলিশ কেন ভি দেখায় হে? সে বুঝি নির্বাচনে হেল্প করেছে? নাকি পুলিশ সেজে কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছিল কলেজে? অভিযুক্তরা নাকি জবাবে বলেছে, আহা! দেখিয়েছে তো কী হয়েছে? পুলিশ বলে কি মানুষ নয়?

বেরসিক বিল

কোচবিহার জেলার রসিক বিল খাতায় কলমে পর্যটন কেন্দ্র। সেখানে ঢুকতে টিকিট লাগে আবার বিনা টিকিটেও ঢোকা যায়। মানে, বিলের চারধারে খাড়া হওয়া বেড়া মাঝে মাঝে ভ্যানিশ থাকার কারণে টিকিট না কাটলেও চলে। বিলের জলে থাকার কথা টলটলে স্বচ্ছতা। বদলে রাশি রাশি কচুরি পানা। অনেক দিন ধরে বলা হচ্ছে, দুর্দান্ত একটা প্রজাপতি উদ্যান বানান হবে। কিন্তু সেটার দেখা নাই। তবে আশার কথা এই যে, সার্ভে নাকি শেষ। এবার গাছ লাগান হবে। গাছ হলে প্রজাপতি আসবে। প্রজাপতি এলে উদ্যান হবে। উদ্যান হলে...। থাক বাবা! আগে গাছ তো পুঁতুক।

সত্যি

হ্যাঁ মশাই! শুনছি মালবাজার থেকে শ্মশান যাওয়ার রাস্তাটা নাকি এমন বিগড়েছে যে মাঝে মাঝে ডেডবডি পর্যন্ত মাচা থেকে ঘাড় তুলে দেখে নেয় চুল্লি আর কত দূরে? শুনছি নাকি সে রাস্তা খোদ পুরপতি স্বপনবাবুর তালুকে? শোনা যাচ্ছে এলাকার পাব্লিক দুঃখ করে বলছে, 'স্বপনবাবু! শ্মশানগামী পথে তো জ্যান্ত লোকেরাও হাঁটাচলা করে! ভুতপ্রেতেরা না হয় উড়ে যাওয়ার সুবিধে পায়, কিন্তু আমরা কী করি কন দেখি?' শুনছি, এই শুনে স্বপনবাবু অভয়বাক্য উচ্চারণ করে বলেছেন, হচ্ছে হচ্ছে। সব সত্যি? তা হলে ঠিক আছে।

টুক্রাণু

জোর 'পিঠে বানাও' কম্পিটিশন রায়গঞ্জে। ডুয়ার্সে শাসক দলের ঠ্যাঙানি খাওয়ার আশঙ্কায় বিজেপি কর্মীরা। রাজবংশী ভাষাদিবসেও শাসক দলের সেমসাইড গোলমাল অব্যাহত জলপাইগুড়িতে। ফুলবাড়ি ব্যারেজ থেকে ভবিষ্যতে চিরকালীন চম্পট দিতে পারে পরিযায়ী পাখিরা। জোড়া বাইসনের জোর হামলায় অস্থির নাগরাকাটা। গরুমারা লাগোয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হামলা চালিয়ে সরস্বতী পুজো বানচাল করে দিল এক দলছুট হাতি। দেওয়ানগঞ্জের বাচ্চাদের পার্কে জমজমাট দারু পানের নিয়মিত আসর ধেঁড়েদের। লেহেঙ্গা না শাড়ি— এই নিয়ে শিলিগুড়িতে বউ-শ্বাশুড়ির তীব্র ঝগড়া গেল থানা পর্যন্ত। হ্যান্ডবিলে নাম না থাকায় অভিমানে কৃষিমেলা উদ্বোধন করতে গেলেন না শীতলখুচির বিধায়ক। গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের জুজুতে গৌরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে সরস্বতী আরাধনা বাতিল। সারমেয়দের স্বর্গ বিশেষ বালুরঘাট হাসপাতাল। দামের অভাবে আলু চাষীদের হৃদকম্প ডুয়ার্সে।

খুচরো ডুয়ার্স

দ্বন্দ্ব

কবি কী বলেছেন তা ভুলে গেলে চলবে কত্তা? বলেছেন, হিস্ট্রিকে ফরগেট করলে ফিরে ফিরে রিটার্ন। গত পঞ্চায়েতে জেলায় কী ঘটেছিল তা ভুললে চলবে? এক্কেবারে ন্যাজে গোবরে হয়েছিল গো! তাই এবার আগে থেকেই দ্বন্দ্ব মেরামতের কাজ শুরু। শুনলেম সেদিন নাকি আলিপুরে সুগন্ধবাবু আর সম্মোহনবাবু পাশাপাশি ছবি তুলে ভাইরাল হয়েছেন। ভাল ভাল! আসলে 'দ্বন্দ্ব' হল বামাচারি বিষয়। এত্তদিন 'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ' করে কী লাভ হল তাদের? নিজেরা যদি সে জায়গায় না যেতে চাস, তবে শিগ্গির 'আপন ঐক্য জিন্দাবাদ' গোছের কাজকর্ম কর! তা কত্তা, পাব্লিক বলছে যে দ্বন্দ্ব সমাসের নাকি কিঞ্চিৎ উন্নতি হচ্ছে। মহাদিদি যদি ডুয়ার্সে আর দু'-এক রাউন্ড পাইচারি করেন, তবে বুদ্ধ-সূর্য-সুগন্ধ-সম্মোহন-মোহনভোগ-বালুকাবেলা-গোঁসাইজি সক্কলে কোমর বেঁধে নেমে পড়বেন পঞ্চায়েত কুরুক্ষেত্রে। আর যদি কত্তা ডায়েলক্টিক বেড়ে যায়? ঠিক ধরসেন! অপোজিশন লাফায় উঠবে! বস্তুবাদে দিন গ্যাসে গিয়া! অহন নাকি 'দ্বন্দ্বমূলক গোষ্ঠিবাদ'-এর কাল!

অব্যাহাতি

ডুয়ার্সের হাতির মোটামুটি সবাই জানে যে মিড ডে মিলের চাল চুরি করাটা সবচে' সোজা। চাল বিষয়ক অভিজ্ঞ হাতিরা 'চালাক' হয়। এক এক সময়ে এক এক চালাক হাতি বাজারে সংবাদে আসেন। সম্প্রতি সংবাদ শিরোনামে যিনি এসেছেন, তার নাম দাঁতাল বুড়ি। শামুকতলা অঞ্চলে তিনি নিয়মিত স্কুলের চালাধার এবং লাগোয়া এলাকার মুদির দোকান থেকে আটা ভাণ্ডার সাফ করে চলেছেন। কখনও কখনও তিনি যখন আসেন না, তখন বাকিরা দলবেঁধে আসেন। তদন্তে প্রকাশ যে তাদের ভাগিয়ে দেওয়ার জন্য পটকা ফাটাবার নিয়ম থাকলেও বর্তমানে বাজারে শব্দবাজির যা হাল তা মোটেই ভয় দেখাবার মতো নয়। সে সব ক্ষীণনাদ পটকায় বিস্ফোরণ হচ্ছে কি হচ্ছে না— তা একক কিংবা যূথবদ্ধ হামলাবাজদের কানে কোনও 'ফ্যাক্টর'-ই না। পার্শ্ববর্তী আসাম রাজ্যে উচ্চনাদ পটকা পাওয়া যায়, কিন্তু খরচ বেশি। মনে করা হচ্ছে যে কেন্দ্রীয় সরকারকে এই মর্মে বোঝাতে হবে যে, প্রতিটি স্কুলে অন্তত

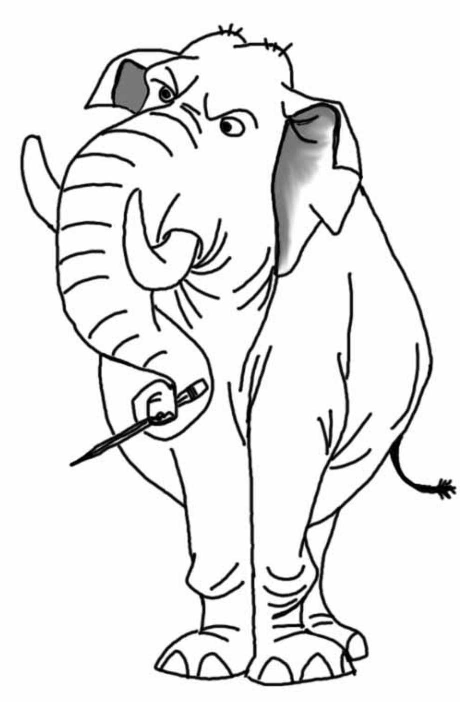

দুটি করে হাতিকে স্টুডেন্ট হিসেবে স্বীকার করে নিলে বাড়তি অনেকটা চাল পাওয়া যাবে। এর ফলে 'হাতি থেকে অব্যাহতি' বা 'অব্যাহাতি' সহজে ঘটবে।

বাঘাদাওয়াত

বাঘকে দাওয়াত দিয়ে এনেছ এবার খাওয়াও! ক্যাটারারকে অর্ডার দিয়ে বাইসন নিয়ে এস ডজন ডজন। ওদিকে ক্যাটারারে সমস্যাও কম নয় কো! বাইসনকে আবার দাওয়াত দিতে হবে যে! মানে জঙ্গলের মাঝে প্রচুর নিরামিষ খাবার রেখে বাইসনদের খেতে আসতে বলতে হবে। খেতে এলেই ঘুম পাড়ানি গুলি ছুঁড়ে 'খপ'! কিন্তু গন্ডা গন্ডা বাইসনকে ইনভাইট করা তো চাট্টিখানি কাজ নয়। ফেসবুকে দিয়ে লাভ নেই। কার্ড পাঠালে সেটা খেয়ে ফেলতে পারে। বাড়ি বয়ে নেমন্তন্ন জানাতে একমাত্র বাঁটুল দ্য গ্রেটই পারে। সুতরাং পলিসি হবে 'হা রে রে রে নিমন্ত্রণ'! মানে, তাড়া করে খাওয়াতে পাঠান। অতিথিকে তাড়া করে বিয়েবাড়িতে নিয়ে যাওয়ার রীতি বেশ অভিনব, সন্দেহ নেই। বিয়েবাড়িতে শেষ ব্যাচে অবশ্য এভাবে তাড়া করে বসাবার নিয়ম আছে। যাই হোক, বাইসনগুলো শেষ পর্যন্ত অন্য অরণ্যে পৌঁছোবে 'খেতে নয়, খাবার হিসেবে'।

দোকান রহস্য

বাণিজ্য ভালই হয়েছিল। সন্ধের পর গুটিকয় বন্ধুর সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা মেরে বাড়ি ফিরে টিভি দেখে, খেয়েদেয়ে ঘুম। পরদিন সকালে দোকানে এসে দেখেন সেটা প্রত্যাশা মতই বন্ধ বটে, কিন্তু তালাগুলো আলাদা। সে কী? তবে ফোন করে কেউ কেউ যে বলছিল, পুলিশ দোকানে তালা মেরে দিয়েছে— সে কথা তবে সত্যি? কিন্তু তাঁর তালাগুলো খুললো কী করে? চাবি তো তাঁর কাছেই ছিল! ঘোর রহস্য! শেষে পুলিশের আগমন এবং জানা গেল যে, দোকানবাবু কাল রাতে বন্ধুদের এগিয়ে দিতে গিয়ে আর ফিরে আসেননি। রাত্তিরে দোকান খোলা পড়ে থাকতে দেখে সিভিক পুলিশরা চাপে পড়ে যায়। অনেকক্ষণ পাহারা দেবার পর ঠিক হয় তালা মেরে দেওয়া হবে। সব শুনে দোকানবাবু স্তব্ধ। নিস্পন্দ। অপলক। এমন ভুলও হয়? এবার বলুন তো কাকা, এ থেকে কী প্রমাণ হয়? জগতে ভাল পুলিশ আছে। ধূপগুড়িতে থাকে।

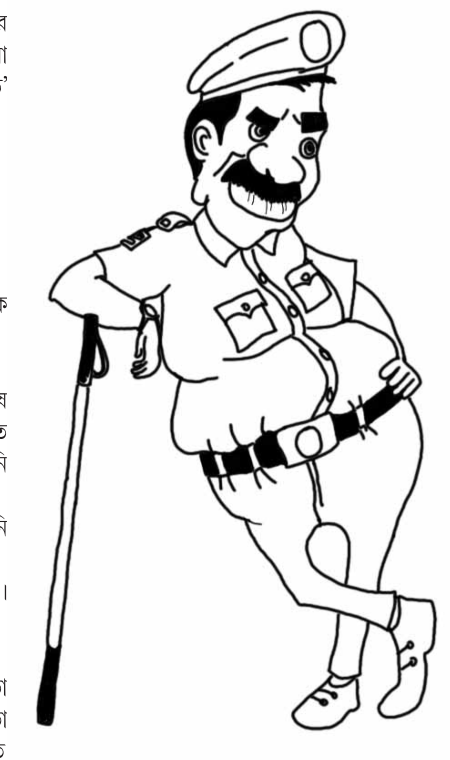

সেদিন

তাঁরা সবাই ছুটছিলেন। বরের পোশাকে, শৌখিন জুতো পরে ছোটা কি কম কথা! তবুও কেউ হন হন করে দু'-মাইল হেঁটেছেন, তারপর চড়েছেন সাইকেলের সামনে। কাউকে বাইক

হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে এসেছিল কনে বাড়ির লোক— ব্যর্থ হয়েছে। কেউ টোপর হাতে ক্ষেতের আল দিয়ে শর্টকাট করেছেন কোনও মতে। তাঁরা কিন্তু সবাই বর। বিয়ের বর। বিয়ে করতে যাচ্ছিলেন সঙ্গীসাথি নিয়ে। কিন্তু সেদিন আবার মহাদিন কি না! একে রবিবার, তায় এদিকে জল্পেশ মেলা আর ওদিকে হুজুর সাহেবের মেলা। ত্র্যহস্পর্শ যোগের ধাক্কায় ধুন্ধুমার জ্যামজট ডুয়ার্সের সড়কে। কিন্তু লগ্ন তো আর জ্যামের কারণে বসে থাকবে না। লগ্ন ধরতে তাই পথে নেমে পড়েছিলেন বরের দল। বরযাত্রী চুলোয় যাক, কোনও মতে বরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য মেয়ের বাড়ির লোকেরা অভাবনীয় সব কান্ড ঘটিয়ে ফেললেন। খুঁজে বের করা হল ছাদনাতলায় সময়মত পৌঁছোবার সব আশ্চর্য রাস্তা। বরেরাও কেউ কেউ সেদিন দেখালেন আশ্চর্য পারফরম্যান্স। এইসব বরকে শ্যালিকারা নাকি 'জ্যামাইবাবু' বলে ডাকছেন। মানে, জ্যাম পেরিয়ে আসা জামাই।

বনে বসন্ত

বসন্ত সমীরণের মধুর পরশ জঙ্গলেও লেগেছে। যেমন ধরুন, গরুমারার ভোঁতা সিং। আহা! গন্ডারকুলের সাক্ষাৎ রোমান্টিক হিরো গো! এমনিতে গন্ডারিয় প্রেমের নিয়ম হল এক গন্ডারনীর পিছে একাধিক গন্ডার লাইন লাগাবে। তারপর গন্ডারে গন্ডারে ভ্রাতৃঘাতি দাঙ্গা। যে টিকবে সে হবে গন্ডারনীর বয়ফ্রেন্ড। এরপর কয়েকদিন ধুন্ধুমার প্রেম এবং তারপর নিজের ঘাসজমি নিজে দেখ নিয়মে বিচ্ছেদ। তা ভোঁতা সিং সে সব মানল কই? গন্ডারনীর পেছনে তাঁকে ঘুরতে দেখে এলাকার কোনও গন্ডার যুবকের ক্ষমতা হয়নি সেদিকে শিঙ তুলে তাকাতে! তারপরে আবার মাস গড়াতে চলল কিন্তু প্রেম থামার লক্ষণ নেই কো! ওদিকে জলদাপাড়ার বাঁয়া গণেশও শুনলেম বসন্তের হাওয়ায় সুবোধ বালকের মত দুই প্রেমিকাকে নিয়ে শালের জঙ্গলে বসন্তের রবীন্দ্রসংগীত গাইছে। আহা! শুনেও সুখ।

টুক্রাণু

গোরুমারার জঙ্গলে আরও এক চিতাকে 'কলার তুলে' ঘুরে বেড়ানর সুযোগ। লাটাগুড়ি লাগোয়া কোনও কোনও রিসর্টে মধ্যরাতে জোরদার আলো জ্বালিয়ে বজ্রনির্ঘোষ সংগীত বাজান হচ্ছে। 'ফালাকাটা পুরসভা হবে'— এই প্রতিশ্রুতির বয়স মাত্র দশ বছর হল। মাফিয়ারা পুনরায় ডুয়ার্সে 'মাটি কাটো পকেট ভরো' কর্মসূচী চালু করেছেন বিভিন্ন নদীতে। ফালাকাটার বেগুনের আচার বিখ্যাত হচ্ছে। প্রচণ্ড গণনা চালিয়েও বক্সার বাঘবনে বাঘের অঙ্ক শূন্যের ওপরে তোলা গেল না। সেদিন একটা হাতি ঘুরতে ঘুরতে শিলিগুড়ি ঢুকে পড়েছিল। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের শালবনে ভ্রাম্যমান ভূতের ফোটো নিয়ে প্রবল উত্তেজনা। রাস্তা তৈরির ধূলোয় রোজ বাধ্যতামূলক হোলি খেলছেন ফালাকাটাবাসী।

এখন ডুয়ার্স প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি
বিশ্বাস বুক এজেন্সি
৯৪৩৪৩২৭৩৪২

শিবমন্দির
অনুপ দাস ৯৮৩২০২৯৫১৪

জলপাইগুড়ি
ভবতোষ ভৌমিক ৯৭৩৩২৪৬৯১৩

মালবাজার
সম্রাট (হোম ডেলিভারি) ৯৩৩২০০৫৮৬৫

চালসা
দিলীপ সরকার ৯৭৭৫৪১৫১৪৪

বিন্নাগুড়ি
রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল
৯৪৩৪৮০৯৫৯০

বীরপাড়া
বরুন ঘোষ, পোকিসা ৯৫৯৩৩৫৪১৫২

মাদারিহাট
জগৎ চৌধুরী ৯৭৪৯৭২৫৭৮১

লাটাগুড়ি
সৌমেন (হোম ডেলিভারি) ৯০০২৪০৯৮৯৩

ময়নাগুড়ি
দেবাশিষ বসুভাট ৯৯৩৩১৯০৮৫৮

ফালাকাটা
অমল চন্দ্র পাল ৯৪৩৪৪১২৬৪৯

আলিপুরদুয়ার
শশাঙ্ক ৯০৪৬৬৯৫৬২৯
সুদীপ্ত (হোম ডেলিভারি) ৮৬০৯০৮৮৯০৭

কোচবিহার
সার্থক পণ্ডিত (হোম ডেলিভারি)
৭০০১২৬৩২৮৬
জয়ন্ত দাস ৯৪৩৪২১৭০৮৪
আরতি ঘোষ, কাছাড়ি মোড়
৯৮৫১২৩৪৮৮৯

মাথাভাঙা
নেপাল সাহা (হোম ডেলিভারি)
৮৯৬৭৯৯৫৮৮৭

মালদা
অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি
৯৯৩২৯৬৭৯৯১

রায়গঞ্জ
সুরঞ্জন সরকার ৯৪৩৪৪২৩৫২২

বালুরঘাট
মাধববাবু ৯১২৬২৬০৬৬৩
ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন
৯৮৩০৪১০৮০৮

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক বিশাল বুক সেন্টার ৪০৬৪৪০৯৭

দেবী চৌধুরানি মন্দির আজও উন্নয়নের অপেক্ষায়

উত্তরবঙ্গের প্রাচীন ও ঐতিহ্যপূর্ণ নিদর্শনগুলোর মধ্যে একটি হল জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের শিকারপুর চা-বাগানের মধ্যে থাকা ভবানি পাঠক ও দেবী চৌধুরানির মন্দির। প্যাগোডা ধাঁচের সেই মন্দির আজ কার্যত আগলে রাখছেন এক আদিবাসী কেয়ারটেকার। তার নাম ভোলা ওঁরাও। তার সঙ্গে আছেন এক পুরোহিত। তার নাম কমল রায়। ঐতিহাসিক এই মন্দিরের সৌন্দর্যায়নের দাবি উঠেছে।

দেশ-বিদেশের বহু পর্যটক এই মন্দিরে আসেন। অথচ মন্দির চত্বরে নেই কোনও বাথরুম, ব্যবস্থা নেই পানীয় জলের। সেখানে বসার কোনও ব্যবস্থাও নেই। মন্দির চত্বরে নেই কোনও ঘেরা দেওয়ার ব্যবস্থা বা ফেন্সিং। এক সময় মন্দিরের কাছেই হাট বসত। আজ আর তা বসে না। অথচ আগে হাট বসার সময় হাট কমিটি থেকে মন্দির দেখভাল করা হত। আজ আর তা নেই। যিনি মন্দিরের কেয়ারটেকার তিনি আসলে চা-বাগানের আদিবাসী শ্রমিক। চা-বাগান থেকেই তিনি বেতন পান। যা বেতন পান তা দিয়ে তার সংসার চলে না। তবুও ঐতিহাসিক মন্দির দেখভাল করার টানেই তিনি সেখানে পড়ে থাকেন। কোনও কোনও দিন বাড়িতে ঠিক মতো রান্না না হলেও তিনি প্রায় সময় মন্দিরে এসে পড়ে থাকেন। সঙ্গে স্থানীয় আদিবাসী খুদি বরাইক, পুতুল বরাইক নিয়মিত মন্দিরে এসে পুজো দেন।

জলপাইগুড়ির গবেষক উমেশ শর্মা জানান, জলপাইগুড়িতে একসময় রাজা ছিলেন দর্পদেব রায়কত। সেই সময় জলপাইগুড়ি ছিল রংপুর জেলার অধীনে। রংপুরে আর একটি স্টেট ছিল, তার নাম মন্থনা। আর তার রানি ছিলেন বিধবা

“দেশ-বিদেশের বহু পর্যটক এই মন্দিরে আসেন। অথচ মন্দির চত্বরে নেই কোনও বাথরুম, ব্যবস্থা নেই পানীয় জলের। সেখানে বসার কোনও ব্যবস্থাও নেই। মন্দির চত্বরে নেই কোনও ঘেরা দেওয়ার ব্যবস্থা বা ফেন্সিং। এক সময় মন্দিরের কাছেই হাট বসত। আজ আর তা বসে না।”

দেবী চৌধুরানি মন্দির

দেবী চৌধুরানি মন্দিরের নেই কোনও পাঁচিল বা সীমানা

জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানি। দেবী চৌধুরানির স্বামী ছিলেন শিবচন্দ্র। তারা একসময় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন করেছিলেন। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে দর্পদেব রায়কতের সঙ্গে তিস্তা পক্ষের যুদ্ধও হয়। রংপুর জেলে এক সময় ১৮ বছর ধরে বন্দি করে রাখা হয় দর্পদেব রায়কতকে। এরপর ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় প্রজাদের ভাল রাখার জন্য রবিন হুডের মতো ধনীদের কাছ থেকে ধন দৌলত ডাকাতি করে তা বিলি করার কাজ শুরু হয়। আর ১৮৮৬ সালে সেই গল্পই স্থান পেয়েছে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দেবী চৌধুরানি উপন্যাসে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় দেবী চৌধুরানি ও দর্পদেব রায়কতকে সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসেন ভবানি পাঠক, ফকির

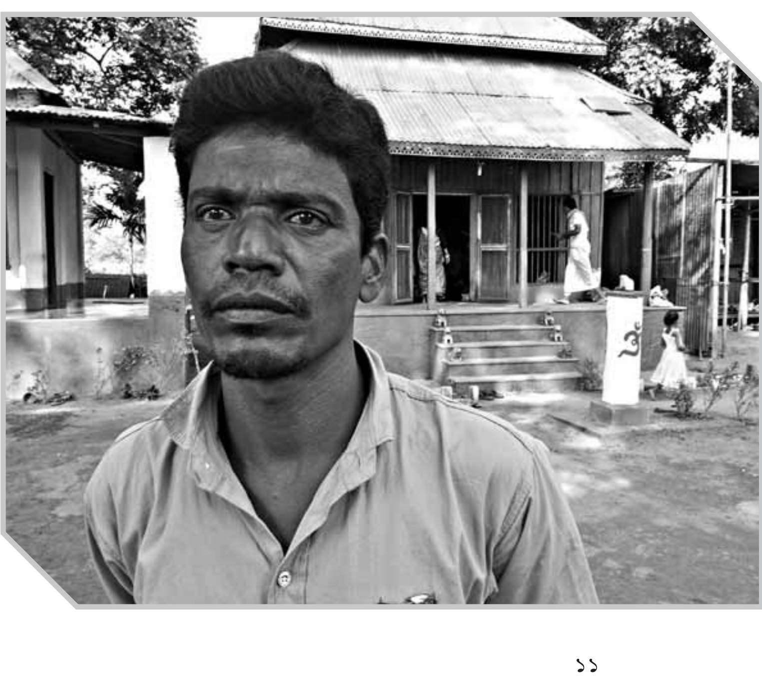

বাঁ দিকে ভোলা ওঁরাও, মন্দিরের রাখওয়ালা

মন্দিরের অন্যান্য দেবদেবী

মন্দিরে মাটির কালী মূর্তি

বিদ্রোহের মজনু সাহা প্রমুখ। তারা সকলে মিলে ব্রিটিশদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। কিন্তু ব্রিটিশদের আধুনিক অস্ত্রের সঙ্গে তাদের লাঠিসোটা আর পেরে ওঠেনি। তবে ব্রিটিশদের সঙ্গে লড়াই করতে ভবানি পাঠক ও দেবী চৌধুরানি বৈকুণ্ঠপুরের দিল্লি ভিটা চাঁদের খাল ও শিকারপুর চা-বাগানের জঙ্গলে ঘাঁটি তৈরি করেন। তারই স্মৃতি আজও বহন করে চলেছে শিকারপুর চা-বাগানের মধ্যে থাকা মন্দিরটি রাজা দর্পদেবের উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। মিস্টার রেমন্ড হেলাইচ পাইন নামে এক ইংরেজ স্থপতি মন্দিরটি নির্মাণ করেন। পড়ে ১৮৭১ সালে রাজা যোগেন্দ্রদেব রায়কতের আমলে মন্দিরটি সংস্কার করা হয়। ভবানি পাঠক ডাকাত সর্দার হিসাবে পরিচিত থাকলেও তিনি সন্ন্যাসীর মতো জীবনযাপন করতেন। তিনি অত্যাচারী ইংরেজ ও দেশিয় জমিদারদের জিনিস লুঠপাট করে তা দীনদরিদ্রদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। আর তারই সুযোগ্য শিষ্য ছিলেন দেবী চৌধুরানি।

সেই মন্দিরে প্রথমে কাঠের মূর্তিই ছিল। দুই পাশে দুটি কাঠের কালী মূর্তি। সেই কালীকে পুজো করেই নাকি ভবানি পাঠক তার অভিযানে বের হতেন। পরে সেই কাঠের মূর্তি পুড়ে যাওয়ায় মাটির মূর্তি তৈরি হয়েছে। মন্দিরের পুরোহিত কমল রায় বলেন, তাদের এই মন্দিরে মা কালীর মূর্তি ছাড়া তিস্তা বুড়ি, ভবানি পাঠক, দেবী চৌধুরানি, গঙ্গা দেবী, সিদ্ধপুরুষ মোহনলালের মূর্তি আছে। তাদের মন্দির প্রতিদিন ভোর পাঁচটায় খোলে, বন্ধ হয় বিকেল পাঁচটায়। কালী পুজো হয় আষাঢ় মাস ও কার্ত্তিক অমাবস্যায়। ১২ বছর ধরে সেখানে গাছের গুড়িতে তপস্যা করেছিলেন ভবানী পাঠক। আজ তাদেরকে তারা পুজো করেন। এই রকম মন্দিরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির দাবি করেছেন পর্যটক সুস্বেতা বসু, শিল্পী পালিত ও কাঞ্চন পালিত। সেই মন্দিরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির দাবি বা প্রস্তাব স্বীকার করেন এলাকার বিধায়ক খগেশ্বর রায়। বিধায়ক জানিয়েছেন ওই ঐতিহাসিক মন্দিরের উন্নতির জন্য তারা পর্যটন দফতরে প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। তবে সেখানে যাওয়ার জন্য তিনি তার বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে সুন্দর রাস্তা তৈরি করে দিয়েছেন।

> "মন্দিরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির দাবি বা প্রস্তাব স্বীকার করেন এলাকার বিধায়ক খগেশ্বর রায়। বিধায়ক জানিয়েছেন ওই ঐতিহাসিক মন্দিরের উন্নতির জন্য তারা পর্যটন দফতরে প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। তিনি তার বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে সুন্দর রাস্তা তৈরি করে দিয়েছেন।"

বাপি ঘোষ

Adventure Sports first time ever at any eco-resort in Dooars

DHUPJHORA SOUTH PARK

Murti, Gorumara NP
Jalpaiguri, West Bengal

Accommodation: Super Delux Room (DBR) 4 nos, Delux Ethnic Rooms (DBR) 4 nos, Standard Family Rooms (4-6 BR) 5 nos.

Facilities: Tea Maker, Cold/Hot running water, attached toilet in every room;
Common Dine-in place for breakfast-lunch- evening snacks-dinner, Conference Hall;
Cycling, Angling, Adventure sports like Burma Bridge, Cylinder Walk, Bosun Chair, Commando Walk and Zip Line.

Marketing & Booking Contact:
Kolkata 9903832123, 9830410808
Siliguri 9474904461, 9002722699

Mystic Murti mesmerises over Gorumara where luxury meets excitement

ডুয়ার্সের চা বাগান চিনুন

ডুয়ার্সের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়েও বাকি পৃথিবী থেকে যেন আজ বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতোই রয়েছে ডুয়ার্সের চা জগৎ। খবরের কাগজে মাঝেমধ্যে চা-শ্রমিকের মৃত্যু সংবাদ, এ ছাড়া আর কেউ আজ জানতে পারে না সে জগতের খবর। বাইরের মানুষের কাছে, নতুন প্রজন্মের কাছে বিশাল এই চা-সাম্রাজ্যের ভূগোল নিয়ে কোনও ধারণাই নেই। 'এখন ডুয়ার্স' এর পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে পাঠককুলকে ডুয়ার্সের চা-বাগানগুলি ধরে ধরে পরিচিত করবার। প্রতিটি বাগান ঘুরে তার সাম্প্রতিকতম পরিচিতি লিপিবদ্ধ করছেন **ভীষ্মলোচন শর্মা**। এবারের পর্বে প্রতিবেদক ঘুরেছেন চালৌনি, কিলকট ও চালসা চা-বাগান। তুলে এনেছেন সেখানকার মানুষের সুখ-দুঃখের কথা।

এবারের ডুয়ার্সের 'চা বাগিচা চিনুন' এপিসোডের সুহানা সফর মেটেলি, চায়ের জনপদ মেটেলি। মেটেলি, নাগেশ্বরী, জুরন্তি, এঙ্গো, চালৌনি, সামসিং, চালসা, ইনডং, কিলকট, সোনগাছি হয়ে মালবাজারে এসে শেষ হবে আমার ক্ষেত্রসমীক্ষার কাজ। জলপাইগুড়ি থেকে রওনা হয়ে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের বাসে এসে পৌঁছালাম চালসা গোলাইতে। সামসিংয়ের বাস ধরে চালসা গোলাই থেকে পাহাড় উজিয়ে যাত্রা মেটেলির দিকে। সামান্য উঁচু হলেও পাহাড়ের সকল বৈশিষ্ট্যই রয়েছে চালসা থেকে মেটেলির যাত্রাপথে। ১৩ কিমি উঠেই এক জায়গায় এসে বাঁকের মুখে দাঁড়াই। নিচে চালসার ছোট্ট জনপদ। তারপর গোরুমারা অরণ্যের বিস্তার আর মূর্তি, কুর্তি, ন্যাওড়া দূরে রূপোলি রেখার মতো দিগন্তে মিলিয়ে যায়। এলাম মেটেলি। আজকে তিনটে বাগান সার্ভে করব। ডানকানসের নাগেশ্বরী এবং গুডরিকসের চালৌনি ও চালসা।

সকালে ঘুমচোখে ধূমায়িত চায়ের কাপে চুমুক না হলে যাকে বলে দিনটাই মাটি। চায়ের টানে ভারতের চায়ের বাজার বাড়তে বাড়তে পৌঁছে গেছে প্রায় দশ হাজার কোটিতে। বিশ্বের দু' নম্বর চা প্রস্তুতকারক দেশের তকমা এখনও আমাদেরই দখলে। তাই বর্তমানে ছুটতে থাকা জীবনযাত্রায় দোকানে গিয়ে মনের মতো চা কিনে আনার সময় আর নেই। তাই ওয়েবসাইটে দেওয়া দাম দেখে অর্ডার করে দিলেই দায়িত্ব নিয়ে সেই চা একেবারে ক্রেতার দেওয়া ঠিকানায় পৌঁছে দেবে কোম্পানি। অন্য ই-কমার্স ওয়েবসাইটের মতোই অর্ডার ট্র্যাকিং করাও সম্ভব হবে এই পোর্টালে। এই দায়িত্ব নিয়েছে গুডরিক। সংস্থার ক্যাচলাইন 'দ্য টি পিপল' এর মতোই তরতাজা মোড়কে। সংস্থার সুবিশাল ঐতিহ্যের কথা মাথায় রেখে আরও বড় কলেবরে গ্রাহককে আরও বেশি করে পরিষেবা পৌঁছে দিতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংস্থা। এর মাধ্যমে বিক্রি চার গুণ বাড়ানোর প্রাথমিক পরিকল্পনা রয়েছে গুডরিকের। গুডরিক টি পট লঞ্চের এক্সক্লুসিব টি টেস্টিং অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পেয়ে গিয়েছিলাম। এসেছিলেন অভিনেত্রী অপরাজিতা আঢ্য। জানালেন যেদিন সকালবেলা চা খান সেদিন গ্রিন টি খান। তবে তিনি চায়ের বিলাসী নন বা রোজ সকালে উঠে চা যে লাগবেই এমনটিও নয়। তবে দার্জিলিং চায়ের বিশেষ ভক্ত তিনি। এক প্রশ্নের জবাবে অপরাজিতা আঢ্য জানালেন রোজ তিন থেকে চারবার দার্জিলিং চা পানের মধ্য দিয়ে তাঁর দৈনন্দিন কাজ শেষ হয়। অনিন্দ চ্যাটার্জির মত আবার অন্যরকমের। তাঁর মতে সকালবেলা অন্য কিছু খাওয়ার আগে এক কাপ গরম চা তাঁর দিনটাকে ঠিকঠাক শুরু করে। তা সে দার্জিলিং চা-ই হোক না কেন বা গ্রিন টি হোক বা পাড়ার মোড়ের চায়ের দোকানের চা-ই হোক। সকলের জীবনে চায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। অনেকে চা পান করেন এনার্জি ড্রিঙ্ক হিসাবে। রোজকার ব্যস্ততম জীবনে এক কাপ যেন নিমিষেই কাটিয়ে দেয় সব ক্লান্তি। তাই চাকে আরও ভিন্ন ভিন্ন স্বাদে বিশ্ববাজারে পৌঁছে দিতে প্রয়াসী হয়েছে গুডরিকস।

গুডরিকস কোম্পানি আইন ১৯৫৬ এর নিয়মানুযায়ী একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসাবে ১৯৭৭ এর ১৪ জুন থেকে চা ব্যবসার কাজে অবতীর্ণ হয়। বিভিন্ন ধরনের চা উৎপাদন এবং ক্রয়বিক্রয় সহ চা উৎপাদনকারী হিসাবে গুডরিক গ্রুপ লিমিটিডে ১৭টি বাগানে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি রূপে চা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হয়। গুডরিক গ্রুপ লিমিটেডের ১৭টি চা বাগান আটটি স্টার্লিং চা কোম্পানির মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠিত করেছিল এবং ভারতে চা ব্যবসা চালায়। স্টার্লিং কোম্পানিগুলি ছিল আসাম-ডুয়ার্স চা কোম্পানি লিমিটেড, লেবন্ত

চা কোম্পানি লিমিটেড, ব্রিটিশ দার্জিলিং চা কোম্পানি লিমিটেড, লিস নদী চা কোম্পানি লিমিটেড, মিনগ্লাস চা কোম্পানি লিমিটেড এবং ডেঙ্গুয়াঝাড় চা কোম্পানি লিমিটেড। ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন অ্যাক্ট (১৯৭৩ সাল) অনুসারে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্টার্লিং কোম্পানিগুলিকে ব্যবসা চালানোর অনুমতি দেওয়ার জন্য সম্মতি প্রদান করে।

বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রাইভেট সেক্টর চা উৎপাদক গুডরিক। চারটি চায়ের উৎপাদনকারী কোম্পানির মধ্যে রয়েছে গুডরিক গ্রুপ লিমিটেড, স্টুয়াটী হোল ইন্ডিয়া লিমিটেড, আমগোরি ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং কুমার চা কোম্পানি লিমিটেড। দার্জিলিং, ডুয়ার্স, আসাম এবং কাছার মিলে গুডরিকসের ২৭টি বাগান আছে। ১৮০০ শতকের শেষের দিকে গুডরিকস চা বাগান প্রতিষ্ঠা করে এবং ধীরে ধীরে তারা ভারতে ব্যবসা চালাতে থাকে। দার্জিলিংয়ের মার্গারেট হোপ, ক্যাসলটন, বাদামটাম, বার্নেসবার্গ, থাবোর অন্তর্ভুক্ত বাগানগুলির থেকে চা জাপান, ইউরোপ এবং যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রি হয়। আসামের বাগিচাগুলির চা মধ্য প্রাচ্য, যুক্ত রাজ্য এবং জার্মানির বাজারে প্রচুর পরিমাণে বিক্রি হয়। লিস নদী এবং ডেঙ্গুয়াঝাড়ের বাগানের চা-ও অত্যন্ত জনপ্রিয় আন্তর্জাতিক মার্কেটে। ডুয়ার্সে সংকোশ, ডেঙ্গুয়াঝাড়, আইভিল, কুমারগ্রাম, জিতি, মিনগ্লাস বাগানের চা সুনামের অধিকারী।

চালৌনি চা বাগান

চালৌনি মেটেলি ব্লকের অন্তর্গত গুডরিকস গ্রুপ লিমিটেডের একটি বাগান। ১৮৮৫ সালে চালৌনি টি গার্ডেনটি স্থাপিত হয় এবং ধীরে ধীরে ফ্যাক্টরি গড়ে ওঠে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৫০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এই বাগানরি কাছেই বাগডোগরা বিমানবন্দর এবং রেল স্টেশন নিউ জলপাইগুড়ি। কাছের শহর মালবাজার যেখান থেকে কলকাতা এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যাবার বাস পাওয়া যায়। বর্তমানে যেখানে বাগানটি অবস্থিত সেখানে ছিল প্রচুর 'চিলৌনি' গাছের জঙ্গল যা এই চা আবাদ অঞ্চল জুড়ে পরিব্যাপ্ত ছিল। এই চিলৌনি গাছের জঙ্গল থেকেই চা-বাগিচার নামকরণ হয়েছে চিলৌনি বা চালৌনি। চা বাগিচার তথ্য অনুযায়ী জানা যায় বাগিচার প্রথম ম্যানেজার ছিলেন পি.সি. ওয়ালিচ যিনি নিজে এবং স্থানীয় একজন মানুষের সহযোগিতায় চিলৌনি টি এস্টেটটি প্রতিষ্ঠা করেন। চিলৌনি এবং হোপ ও জিতি চা-বাগান হোপ টি কোম্পানির অধীনে ছিল এবং এই কোম্পানিটি ছিল ডানকানস ব্রাদার্স অ্যান্ড কোং এর একটি শাখা, যেটা ১৯৭৭ সালে গুডরিক গ্রুপ লিমিটেডের সঙ্গে সংযুক্তিকরণ ঘটে। চালৌনি অত্যন্ত সুন্দর একটি বাগান। এর উত্তরে কালিম্পং জেলার সংরক্ষিত বনাঞ্চল। পর্বতশৃঙ্গের সমাহারে সুউচ্চ হিমালয় পর্বতমালা

গুডরিকসের হাসপাতাগুলির পরিচ্ছন্নতা ও পরিকাঠামো প্রশ্নাতীত

> দার্জিলিংয়ের মার্গারেট হোপ, ক্যাসলটন, বাদামটাম, বার্নেসবার্গ, থাবোর অন্তর্ভুক্ত বাগানগুলির থেকে চা জাপান, ইউরোপ এবং যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রি হয়। আসামের বাগিচাগুলির চা মধ্য প্রাচ্য, যুক্ত রাজ্য এবং জার্মানির বাজারে প্রচুর পরিমাণে বিক্রি হয়। লিস নদী এবং ডেঙ্গুয়াঝাড়ের বাগানের চা-ও অত্যন্ত জনপ্রিয় আন্তর্জাতিক মার্কেটে। ডুয়ার্সে সংকোশ, ডেঙ্গুয়াঝাড়, আইভিল, কুমারগ্রাম, জিতি, মিনগ্লাস বাগানের চা সুনামের অধিকারী।

বাগানের সৌন্দর্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছে। চালৌনি চা-বাগানের পাশেই সামসিং, মেটেলি, নাগেশ্বরী, এঙ্গো এবং জুরন্তি বাগান সৌন্দর্যের ডালি নিয়ে অবস্থিত। একাধিক ঝরনা পর্বতগাত্র থেকে নৃত্যরতা হয়ে অফুরন্ত বারিরাশি নিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত এবং বর্ষাকালে এক অসাধারণ দৃশ্যকল্প রচিত হয় চা-বাগিচা এবং পর্বতবেষ্টিত এই ভূখণ্ডে।

মালবাজার মহকুমার গুডরিক গ্রুপ লিমিটেড পরিচালিত চিলৌনি টি গার্ডেনটিকে ডিবিআইটিএ পরিচালিত সহায়তা প্রদান করে থাকে। বর্তমান কোম্পানি ১৯৭৭ সালে বাগানটির দায়িত্বভার গ্রহণ করে। বাগানে মোট ম্যানেজেরিয়াল স্টাফ ৪ জন। ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, গুডরিকের নামে ক্যামেলিয়া হাউস, ১৪ গুরুসদয় দত্ত রোড, কলকাতা-১৯ থেকে কোম্পানির কাজকর্ম পরিচালিত হয়। বাগানে প্রতিষ্ঠিত এবং স্বীকৃত ট্রেড ইউনিয়ন এনইউপি ডব্লিউ, পিটিডব্লিউইউ, টিটিপিডব্লুউইউ, ডিটিডিপিএলইউ। বাগানে সার্ভে করতে গিয়ে পেলাম শ্রমিক নেতা বিপুল চিক বরাইককে। বিপুল মেটেলি হাইস্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করা শিক্ষিত ছেলে। রবিবারের মেটেলি হাটে বিপুলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন মেটেলি হাইস্কুলের এক মাস্টারমশাই। জানালেন শ্রমিক সম্পর্কিত বেশ কিছু তথ্য বিপুলের কাছ থেকে পাব। পেলামও। বিপুলের কথার নির্যাস থেকে যেটা বেরিয়ে এল সেটা হল চা শিল্পে শ্রমিকদের অবস্থা আদিম ও সেকেলে। বাংলার পর্বতেই হোক বা সমতলে— সর্বত্রই চা বলয়ের শ্রমিকরা সবদিক দিয়ে পিছিয়ে। ১৯৫১ সালে প্ল্যানটেশন অ্যাক্ট চালু হলেও চা শ্রমিকরা আজও জানে না প্ল্যানটেশন অ্যাক্টে তাদের কী কী সুবিধা দেওয়া হয়েছে। প্ল্যানটেশন অ্যাক্টে মহিলা শ্রমিকদের মেটারনিটি লিভ, চিকিৎসার উন্নতি, বাসস্থানের উন্নতি, জীবানুমুক্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা, বাসস্থানের সঙ্গে উন্নত ল্যাট্রিন এবং প্রস্রাবাগারের ব্যবস্থা, শ্রমিকদের খাবার

চালৌনি টি গার্ডেনের হাসপাতালে রোগীদের চিকিৎসা চলছে

সরবরাহর জন্য ক্যান্টিনের ব্যবস্থা, শিশুদের রাখার জন্য ক্রেশের ব্যবস্থা, কাজের সময় শ্রমিকদের ওয়াটারপ্রুফ বা ছাতা এবং শীতকালে কম্বল প্রদানের কথা বলা হলেও কার্যক্ষেত্রে শ্রমিকদের জোটে না কিছুই। চা-বাগিচায় হাসপাতাল স্থাপন এবং শ্রমিকদের চিত্ত বিনোদনের জন্য উন্নত ব্যবস্থা নেবার কথা বলা হলেও কতটা জোটে তা সকলেই জানে।

বেরিয়ে পড়লাম চিলৌনি বাগান সার্ভেতে। প্রথমেই এলাম হাসপাতালে। চা-বাগিচায় বেশ বড়ই হাসপাতালটি। ভিতরেই ডিসপেনসারি, পুরুষ-মহিলা-আইসোলেশন ওয়ার্ড-মেটারনিটি ওয়ার্ড আছে। তবে মেটারনিটি বা মাতৃত্বকালীন চিকিৎসার ক্ষেত্রে রোগিনিকে সরকারি হাসপাতাল বা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মেল ওয়ার্ড ৪টি, ফিমেল ওয়ার্ড ৪টি, আইসোলেশন ওয়ার্ড দুটি আছে। অপারেশন থিয়েটারও আছে, তবে তা কাজ চালাবার মতো। অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা সচল, বাগিচায় ক্ষেত্রসমীক্ষার সময় পেলাম এল.এম.এফ ডাক্তার এ সি সাহাকে। সাবেক বাড়ি বাংলাদেশে। বেশি কিছু বলতে অস্বস্তি বোধ করছিলেন। জিজ্ঞাসা করাতে জানালেন তাঁর রেজিস্ট্রেশন নম্বর ডব্লিউবি-৩০০০৫ এবং এটি মেডিক্যাল কাউন্সিল দ্বারা অনুমোদিত। চালৌনিতে প্রশিক্ষিত নার্স ২ জন। একজন মিড ওয়াইফ। একজন স্বাস্থ্যকর্মী। অনুমোদিত চার্ট অনুযায়ী পথ্য সরবরাহ করা হয় বলে দাবী জানালেও রোগী বা পথ্য কোনওটাই চোখে পড়ল না। গড়ে বাগানে ১০-১২ রোগীনি প্রতিবছর মাতৃত্বকালীন সুযোগসুবিধা লাভ করে। গড়ে ৩০০-৩৫০ জনকে প্রতিবছর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রেফার করতে হয়। বাগিচায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই। ইনডংয়ে আছে। আবাসিক হিসাবে ডাক্তারবাবু বাগিচায় থাকেন। নার্সের নাম অঞ্জ প্রধান। বাগিচায় পর্যাপ্ত কাজ চালাবার মতো ওষুধ পাওয়া যায়, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকেও প্রয়োজনভিত্তিক সহযোগিতা পাওয়া যায়। ওষুধের তালিকার স্টক রেজিস্টার ঠিকমতো দেখাশোনা হলেও উন্নতমানের পথ্য বা নিয়মিত ডায়েট চার্ট অনুযায়ী পথ্য কোম্পানি থেকে নিয়মিত সরবরাহ করা হয় না বলে অভিযোগ। তবে অন্যান্য শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে মনে হল হাসপাতাল পরিষেবা সম্পর্কে তাদের সেই ধরনের কোনও অভাব অভিযোগ নেই।

হাসপাতালের বর্জ্য ফেলার পাত্র

চালৌনি চা বাগিচায় ব্যক্তিগত ইলেকট্রিক মিটারসহ পাকা বাড়ির সংখ্যা একটিও নেই, ৭০০টি পাকা বাড়ি ক্লাস্টারমিটার যুক্ত। বৈদ্যুতিক সংযোগবিহীন শ্রমিক আবাস নেই বললেই চলে। আধা পাকা বাড়িও নেই, তবে বেশ কিছু অস্থায়ী আবাসগৃহ এবং অফিসবাড়ি, ফ্যাক্টরিসহ অন্যান্য বাড়ির সংখ্যা ৭১। এগুলিও ক্লাস্টার মিটারের অন্তর্ভুক্ত। মোট শ্রমিক আবাস ৭৭১টি এবং মোট শ্রমিকসংখ্যা ১২৮৯। বাগানে শতকরা ৬০ শতাংশ শ্রমিক আবাস এবং অন্যান্য বাসগৃহ আছে। শ্রমিক আবাস নির্মাণ, মেরামতি বা রক্ষণাবেক্ষণের কাজে কোম্পানি সাহায্য সহযোগিতা করে থাকে। গড়ে বছরে শ্রমিক আবাস পিছু কোম্পানি ১০ লক্ষ টাকা খরচ করে। চা বাগিচায় শৌচাগারের সংখ্যা ৩০৮টি। বাগানটি অনেক আগে থেকেই বৈদ্যুতিন পরিষেবা পায়।

চালৌনি চা-বাগানের আয়তন ৭৭৮.৯৬ হেক্টর। চাষযোগ্য আবাদীক্ষেত্র ৭৭৮.৯৬ হেক্টর। আপরুটেড এবং নতুন বপনযোগ্য আবাদীক্ষেত্র ২৬.৪৬ হেক্টর। ড্রেন এবং সেচের সুবিধাযুক্ত অঞ্চল ৫৬২.৯৩ হেক্টর। মোট চাষযোগ্য উৎপাদনক্ষম আবাদীক্ষেত্র ৫৬২.৯৩ হেক্টর। প্রতি হেক্টর উৎপাদনযোগ্য এবং ড্রেন ও সেচযুক্ত 'প্ল্যান্টেশন এরিয়া' থেকে প্রতি হেক্টর জমি পিছু ১৫২৯ কেজি করে চা উৎপাদিত হয়।

চালৌনি চা-বাগিচার সাব স্টাফের সংখ্যা ৯৪ জন। করণিক ৯ জন। ক্ল্যাকিকাল এবং টেকনিক্যাল স্টাফ ১৪ জন। বাগানে শ্রমিক পরিবারের সংখ্যা ৮১৯। মোট জনসংখ্যা ৪৬৫২। স্থায়ী শ্রমিক ১০৯৭ জন। এরা দৈনিক নির্দিষ্ট পরিমাণ পাতা তোলার বিনিময়ে নির্দিষ্ট মজুরি পায়। বিগত আর্থিক বছরে অস্থায়ী শ্রমিক (বিঘা শ্রমিক) সংখ্যা ১২৩৬ জন। ফ্যাক্টরিতে নিযুক্ত স্টাফ এবং শ্রমিক সংখ্যা ৩৯ জন। কম্পিউটার অপারেটর নেই। সর্বমোট সাবস্টাফ ৯৪ জন। ক্ল্যারিকাল টেকনিক্যাল এবং শ্রমিক মিলে মোট শ্রমিক সংখ্যা ২৭ জন। মোট কর্মরত শ্রমিক ১২৮৯ জন। শ্রমিক নয় এমন সদস্যদের সংখ্যা ৩৩৬৩ জন।

চালৌনি চা-বাগিচার নিজস্ব উৎপাদিত চা ৩৪-৪০ লাখ কেজি এবং ফ্যাক্টরিতে প্রস্তুত মোট বিক্রয়যোগ্য চা ৬-৭ লক্ষ কেজি। বহিরাগত বাগান থেকে সংগৃহীত এবং কেনা কাঁচা চা-পাতায় প্রস্তুত বিক্রয়যোগ্য চা ফ্যাক্টরিতে উৎপাদিত হয় না। ফ্যাক্টরিতে প্রস্তুত মোট বিক্রয়যোগ্য চায়ের পরিমাণ ৬-৭ লক্ষ কেজি। উৎপাদিত চায়ের প্রকৃতি অনুযায়ী এই বাগানে সিটিসি কোয়ালিটি চা উৎপাদিত হয়। উৎপাদিত চা ইনঅরগ্যানিক প্রকৃতির। চালৌনি বাগানটি চরিত্রগত দিক থেকে অত্যন্ত উন্নতমানের বাগান।

চালৌনি টি গার্ডেন এসজিআরওয়াই বা এমজিএনআরইজিএস-এর সুবিধা পায় না। ব্যাঙ্কের কাছে বাগানটি আর্থিকভাবে দায়বদ্ধ। আর্থিক সুবিধা প্রদানকারী ব্যাঙ্কের নাম এইচএসবিসি। বাগান পরিচালনার কার্যকর মূলধন আসে ব্যাঙ্ক, নিজস্ব অর্থনৈতিক সোর্স এবং চা বিক্রি বাবদ আয় থেকে। বাগানটির লিজ হোল্ডার গুডরিক গ্রুপ লিমিটেড। বর্তমান লিজের ভ্যালিডিটির সময়সীমা ২০২৫ সাল পর্যন্ত।

বাগানে ক্যান্টিন আছে একটি। ভরতুকি দেওয়া হয় না। খাদ্যদ্রব্যের বা সামগ্রীর দাম বোর্ডে দেওয়া হয় না। বাগিচায় ক্রেশের সংখ্যা একটি। পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা আছে। ক্রেশে শৌচাগার আছে । দুধ, বিস্কুট বা পুষ্টিকর খাবার ক্রেশের শিশুদের সরবরাহ করা হয়। ক্রেশে নিয়মিত পোশাক দেওয়া হয়। পানীয় জল পর্যাপ্ত পরিমাণ, তবে পানীয় জলও সময়ে সময়ে ব্যবহারযোগ্য নয়। ক্রেশে মোট অ্যাটেনডেন্ট ২ জন। বাগিচায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। বাগিচা সংলগ্ন উচ্চবিদ্যালয় নেই। শ্রমিক সন্তানদের বিদ্যালয়ে নেওয়ার জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা আছে। যানবাহনের সংখ্যা একটি বাস। বাগানে বিনোদমূলক ক্লাব আছে, খেলার মাঠ আছে।

চিলৌনি চা-বাগানে লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার আছেন, নাম পলাশকান্তি করন। নিয়োগের তারিখ ০১.০৪.২০১১। বাগিচায় বোনাসের শতকরা হার ২০ শতাংশ। প্রায় ৬০-৭০ হাজার টাকা বোনাসের সময় ব্যয় হয়।

চিলৌনি টি গার্ডেনে বিগত অর্থবর্ষে গড়ে ৮০ লক্ষ টাকা প্রভিডেন্ড ফান্ড খাতে জমা

> চিলৌনি টি গার্ডেনে বিগত অর্থবর্ষে গড়ে ৮০ লক্ষ টাকা প্রভিডেন্ড ফান্ড খাতে জমা পড়েছে। চিলৌনি চা-বাগিচায় মালিকপক্ষই প্রভিডেন্ড ফান্ডের পুরো অর্থ দিয়ে দেয়। বকেয়া প্রভিডেন্ড ফান্ডের অর্থ শ্রমিকরা পেয়েছে। মজুরি চুক্তি অনুযায়ী দেওয়া হয়। শ্রমিকদের মজুরি বকেয়া নেই।

পড়েছে। চিলৌনি চা-বাগিচায় মালিকপক্ষই প্রভিডেন্ড ফান্ডের পুরো অর্থ দিয়ে দেয়। বকেয়া প্রভিডেন্ড ফান্ডের অর্থ শ্রমিকরা পেয়েছে। মজুরি চুক্তি অনুযায়ী দেওয়া হয়। শ্রমিকদের মজুরি বকেয়া নেই। রেশন বকেয়া নেই। শ্রমিকদের জ্বালানি/চপ্পল/ছাতা/কম্বল নিয়মিত সরবরাহ করা হয়। বিগত অর্থ বর্ষে গ্র্যাচুইটি বাবদ বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা। বছরে গড়ে ৬০-৭০ জন শ্রমিক অবসরের পরে গ্র্যাচুইটি পেয়ে থাকেন। শ্রমিকদের গ্র্যাচুইটির অর্থ বকেয়া নেই।

চালসা টি গার্ডেন

মালবাজার মহকুমার চালসা টি গার্ডেনটির পরিচালক গোষ্ঠী গুডরিক গ্রুপ লিঃ কোম্পানি। বাগানটি ডিবিআইটিএর সদস্য। বর্তমান কোম্পানি ১৯৭৭ সালে বাগানটির দায়িত্বভার গ্রহণ করে। বাগানে মোট ম্যানেজেরিয়াল স্টাফ ৫ জন।

চালসা চা-বাগানের আয়তন ৬২৪.০৯ হেক্টর। চাষযোগ্য আবাদীক্ষেত্র ৬২৪.০৯ হেক্টর। এক্সটেনডেড জমির পরিমাণ নেই। আপরুটেড এবং নতুন বপনযোগ্য আবাদীক্ষেত্র ১৪.৪১ হেক্টর। ড্রেন এবং সেচের সুবিধাযুক্ত অঞ্চল ৩২৭.২৫ হেক্টর। মোট চাষযোগ্য উৎপাদনক্ষম আবাদীক্ষেত্র ৪৪২.১৩ হেক্টর। প্রতি হেক্টর উৎপাদনযোগ্য এবং ড্রেন ও সেচযুক্ত 'প্ল্যান্টেশন এরিয়া' থেকে প্রতি হেক্টর জমি পিছু ২১০৬ কেজি করে চা উৎপাদিত হয়। বাগানে প্রতিষ্ঠিত এবং স্বীকৃত ইউনিয়ন ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্স এবং প্রোগ্রেসিভ টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন।

চালসা চা-বাগিচার সাব স্টাফের সংখ্যা ৭৮ জন। করণিক ১২ জন। ক্ল্যারিকাল এবং টেকনিক্যাল স্টাফ ১৭ জন। বাগানে শ্রমিক পরিবারের সংখ্যা ৬৯৫ জন। মোট জনসংখ্যা ৪৫৮৭ জন। স্থায়ী শ্রমিক ১১২৪ জন। এরা দৈনিক নির্দিষ্ট পরিমাণ পাতা তোলার বিনিময়ে নির্দিষ্ট মজুরি পায়। বিগত আর্থিক বছরে অস্থায়ী শ্রমিক (বিঘা শ্রমিক) সংখ্যা ৫৭৫ জন। ফ্যাক্টরিতে নিযুক্ত স্টাফ এবং শ্রমিক সংখ্যা ১৫৬ জন। চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক সংখ্যা ২০ জন। কম্পিউটার অপারেটর একজন। সর্বমোট সাবস্টাফ ৭৮ জন। ক্ল্যারিক্যাল, টেকনিক্যাল শ্রমিক মিলে মোট শ্রমিক সংখ্যা ৩৪ জন। মোট কর্মরত শ্রমিক ১৪১৩ জন। শ্রমিক নয় এমন সদস্যদের সংখ্যা ৩২৭৪ জন।

চা চা-বাগিচার নিজস্ব উৎপাদিত চা ৩৫ লাখ কেজি এবং ফ্যাক্টরিতে প্রস্তুত মোট বিক্রয়যোগ্য চা ৭-৭.৫ লক্ষ কেজি। বহিরাগত বাগান থেকে সংগৃহীত এবং কেনা কাঁচা চা পাতায় প্রস্তুত বিক্রয়যোগ্য চায়ের পরিমাণ ১১ লক্ষ কেজি। ফ্যাক্টরিতে প্রস্তুত মোট বিক্রয়যোগ্য চায়ের পরিমাণ ১৮-১৯ লক্ষ কেজি। উৎপাদিত চায়ের প্রকৃতি অনুযায়ী এই বাগানে সিটিসি কোয়ালিটি চা উৎপাদিত হয়। উৎপাদিত চা ইনঅরগ্যানিক প্রকৃতির। চালসা বাগানটি

চালসা চা-বাগানে নতুন প্ল্যান্টেশন

কিলকট চা-বাগানে পাতি আনার ট্রাক সারানো হয় না দীর্ঘকাল

চরিত্রগত দিক থেকে উন্নত প্রকৃতির বাগান।

চালসা টি গার্ডেন এসজিআরওয়াই বা এমজিএনআরইজিএস-এর সুবিধা পায় না। ব্যাঙ্কের কাছে বাগানটি দায়বদ্ধ। আর্থিক সুবিধা প্রদানকারী ব্যাঙ্কের নাম এইচএসবিসি। বাগান পরিচালনার কার্যকর মূলধন আসে ব্যাঙ্ক, নিজস্ব আর্থিক সোর্স এবং চা বিক্রি বাবদ আয় থেকে। বাগানটির লিজ হোল্ডার গুডরিকগ্রুপ লিমিটেড। বর্তমান লিজের ভ্যালিডিটির সময়সীমা ২০২৭ সাল পর্যন্ত।

চালসা চা-বাগিচায় ব্যক্তিগত ইলেকট্রিক মিটারসহ পাকাবাড়ির সংখ্যা ৬৮২টি। বৈদ্যুতিক সংযোগবিহীন শ্রমিক আবাস নেই। অন্যান্য বাড়ির সংখ্যা ১১১। মোট শ্রমিক আবাস ৮০১। শ্রমিক সংখ্যা ১৪১৩। বাগিচায় শতকরা ৫৭ শতাংশ শ্রমিক আবাস এবং অন্যান্য বাসগৃহ। শ্রমিক আবাস নির্মাণ, মেরামতি এবং রক্ষণাবেক্ষণে বাৎসরিক গড় খরচ ২০ লাখ।

চালসা চা-বাগিচায় হাসপাতালের সংখ্যা একটি। ডিসপেনসরির সংখ্যাও একটি। আলাদাভাবে পুরুষ/মহিলা/আইসোলেশন ওয়ার্ডের ব্যবস্থা আছে। মেটারনিটি ওয়ার্ডও আছে। মেল ওয়ার্ডের সংখ্যা নয়টি এবং ফিমেল ওয়ার্ড নয়টি। আইসোলেশন ওয়ার্ড নয়টি। বাগিচার হাসপাতালে অপারেশন থিয়েটার আছে। বাগিচায় অ্যাম্বুলেন্স আছে।

বাইরে চিকিৎসার জন্য গড়ে ২০০ জন শ্রমিককে রেফার করা হয়। বাগিচায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে। চা বাগিচায় ডাক্তার আছে। ডাক্তারের নাম ড. অনুপ ডেকা। তিনি আবাসিক হিসাবে বাগিচায় নিযুক্ত। শিক্ষাগত যোগ্যতা এমবিবিএস। গুয়াহাটি বাগিচায় মেডিক্যাল কলেজ থেকে তিনি পাস করেছেন। তাঁর পদটি ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিল দ্বারা অনুমোদিত। চালসা চা-বাগানে প্রশিক্ষিত নার্সের সংখ্যা ২ জন। নার্সের সহযোগী আয়া বা সমতুল

‘চালসা চা-বাগিচায় হাসপাতালের সংখ্যা একটি। ডিসপেনসরির সংখ্যাও একটি। আলাদাভাবে পুরুষ/মহিলা/আইসোলেশন ওয়ার্ডের ব্যবস্থা আছে। মেটারনিটি ওয়ার্ডও আছে। মেল ওয়ার্ডের সংখ্যা নয়টি এবং ফিমেল ওয়ার্ড নয়টি। আইসোলেশন ওয়ার্ড নয়টি। বাগিচার হাসপাতালে অপারেশন থিয়েটার আছে। বাগিচায় অ্যাম্বুলেন্স আছে।’

মিডওয়াইফ একজন। কম্পাউন্ডার একজন। স্বাস্থ্য সহযোগী একজন। বাগিচায় পর্যাপ্ত ওষুধ সরবরাহ হয়। ওষুধের তালিকা স্টক অনুযায়ী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নোটিশ বোর্ডে দেওয়া হয় না। উন্নতমানের পথ্য সরবরাহ করা হয়। নিয়মিত ডায়েট চার্ট অনুসরণ করা হয়। মেটারনিটির সুবিধা পাওয়া নারী শ্রমিকদের বাৎসরিক গড় জানা যায়নি।

বাগানে ক্যান্টিন আছে। ভরতুকি দেওয়া হয় না। খাদ্যদ্রব্যের বা সামগ্রীর দাম বোর্ডে দেওয়া হয় না। বাগিচায় ক্রেশের সংখ্যা স্থায়ী একটি, ভ্রাম্যমান একটি। পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা আছে। ক্রেশে শৌচাগার আছে। দুধ, বিস্কুট বা পুষ্টিকর খাবার ক্রেশের শিশুদের সরবরাহ করা হয়। ক্রেশে নিয়মিত পোশাক দেওয়া হয়। পানীয় জল পর্যাপ্ত পরিমাণ। পানীয় জলও সময়ে সময়ে ব্যবহারযোগ্য নয়। ক্রেশে মোট অ্যাটেনডেন্ট তিনজন। বাগিচায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। বাগিচা সংলগ্ন উচ্চবিদ্যালয় আছে। বিদ্যালয়ের নাম মেটেলি হাই স্কুল। মিডিয়াম বাংলা। শ্রমিক-সন্তানদের বিদ্যালয়ে নেওয়ার জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা আছে। যানবাহনের সংখ্যা একটি বাস। বাগানে বিনোদনমূলক ক্লাব আছে। খেলার মাঠ আছে।

চা-বাগানে লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার আছেন, নাম রাহুল শর্মা। নিয়োগের তারিখ ১৫.০৭.২০০৭।

চালসা চা-বাগানে শতকরা ২০ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়া হয়। শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ২০০০। চালসা টি গার্ডেনে বিগত অর্থবর্ষে ৮০-৯০ লক্ষ টাকা প্রভিডেন্ড ফান্ড খাতে জমা পড়েছে। বোনাস বাবদ বরাদ্দও প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা বছরে। বাগিচায় মালিকপক্ষই প্রভিডেন্ড ফান্ডের পুরো অর্থই দিয়ে দেয়। মজুরি চুক্তি অনুযায়ী দেওয়া হয়। শ্রমিকদের মজুরি বকেয়া নেই। রেশন বকেয়া নেই। শ্রমিকদের জ্বালানি/চপ্পল/ছাতা/কম্বল নিয়মিত সরবরাহ করা হয়। বিগত অর্থবর্ষে গ্র্যাচুইটি বাবদ বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ প্রায় ২০ লাখ। বছরে গড়ে ৫০-৬০ জন শ্রমিক গ্র্যাচুইটি পেয়ে থাকেন। শ্রমিকদের গ্র্যাচুইটির অর্থ বকেয়া নেই।

কিলকট টি গার্ডেন

মালবাজার মহকুমার কিলকট টি গার্ডেনটির পরিচালক গোষ্ঠী ডানকানস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। বাগানটি কোনও সংগঠনের সদস্য নয়। বর্তমান কোম্পানি ১৮৮৯ সালে বাগানটির দায়িত্বভার গ্রহণ করে। বাগানে মোট ম্যানেজেরিয়াল স্টাফ ৫ জন। বাগানের স্বীকৃত ট্রেড ইউনিয়ন প্রোগ্রেসিভ টি ওয়ার্কাস ইউনিয়ন।

কিলকট চা-বাগানের আয়তন ৬৩৬.৪৬ হেক্টর। চাষযোগ্য আবাদীক্ষেত্র ৪৪২.৩১ হেক্টর। এক্সটেনডেড জমির পরিমাণ জানা যায়নি। আপরুটেড এবং নতুন বপনযোগ্য আবাদীক্ষেত্র ৭১.৬৩ হেক্টর। ড্রেন এবং সেচের সুবিধাযুক্ত অঞ্চল ৪৩০.৪৩ হেক্টর। মোট চাষযোগ্য উৎপাদনক্ষম আবাদীক্ষেত্র ৪৩৭.৫৭ হেক্টর। প্রতি হেক্টর উৎপাদনযোগ্য এবং ড্রেন ও সেচযুক্ত ‘প্ল্যান্টেশন এরিয়া’ থেকে প্রতি হেক্টর জমি পিছু ১৬৯৭ কেজি করে চা উৎপাদিত হয়।

কিলকট চা-বাগিচার সাব স্টাফের সংখ্যা ৯০ জন। করণিক ৭ জন। ক্ল্যারিক্যাল এবং টেকনিক্যাল স্টাফ ১৬ জন। বাগানে শ্রমিক পরিবারের সংখ্যা ৬১৬ জন। মোট জনসংখ্যা ৪৫০০ জন। স্থায়ী শ্রমিক ৮৯৯ জন। এরা দৈনিক নির্দিষ্ট পরিমাণ পাতা তোলার বিনিময়ে নির্দিষ্ট মজুরি পায়। বিগত আর্থিক বছরে অস্থায়ী শ্রমিক (বিঘা শ্রমিক) সংখ্যা ৩০৯ জন। ফ্যাক্টরিতে নিযুক্ত স্টাফ এবং শ্রমিক সংখ্যা ২১৫ জন। চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক সংখ্যা নেই। কম্পিউটার অপারেটর একজন। সর্বমোট সাবস্টাফ ৯০ জন। ক্ল্যারিক্যাল, টেকনিক্যাল শ্রমিক মিলে মোট শ্রমিক সংখ্যা ২৭ জন। মোট

কর্মরত শ্রমিক ১২৩১ জন। শ্রমিক নয় এমন সদস্যদের সংখ্যা ৩২৬৯ জন।

কিলকট চা-বাগিচার নিজস্ব উৎপাদিত চা ৩০-৩৪ লক্ষ কেজি এবং ফ্যাক্টরিতে প্রস্তুত মোট বিক্রয়যোগ্য চা ৭-৮ লক্ষ কেজি। বহিরাগত বাগান থেকে সংগৃহীত এবং কেনা কাঁচা চা পাতায় প্রস্তুত বিক্রয়যোগ্য চায়ের পরিমাণ গড়ে ১০০০০ কেজি। ফ্যাক্টরিতে প্রস্তুত মোট বিক্রয়যোগ্য চায়ের পরিমাণ ৭.৫-৮ লক্ষ কেজি। উৎপাদিত চায়ের প্রকৃতি অনুযায়ী এই বাগানে সিটিসি কোয়ালিটি চা উৎপাদিত হয়। উৎপাদিত চা ইন অরগ্যানিক প্রকৃতির।

কিলকট চা-বাগানটির লিজ হোল্ডার ডানকান্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। বর্তমান লিজের ভ্যালিডিটি ২৩.০৮.২০২৫ পর্যন্ত। ব্যাঙ্কের কাছে বাগানটি আর্থিকভাবে দায়বদ্ধ কিনা বা বাগান পরিচালনার জন্য মূলধন কোথা থেকে আসে এই বিষয়ে কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। কর্তৃপক্ষের তথ্য গোপন করার মনোভাব সন্দেহ সৃষ্টি করে। বাগিচায় ব্যক্তিগত ইলেট্রিক মিটারসহ পাকাবাড়ির সংখ্যা মাত্র ১৬৪। ৪৫২টি ক্লাস্টার মিটারযুক্ত। মোট শ্রমিক আবাস ৬১৬। শ্রমিক সংখ্যা ১২৩১ জন। বাগানে শতকরা ৫০ শতাংশ শ্রমিক আবাস এবং অন্যান্য বাসগৃহ আছে। শ্রমিক আবাস নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের বাৎসরিক গড় ব্যয় শুনলে যে কোনও বাগিচা কর্তৃপক্ষের চোখ কপালে উঠবে। শ্রমিক কল্যাণে কোনও খরচই কার্যত করে না ডানকানস কর্তৃপক্ষ এই কিলকট চা বাগিচায়। বাগিচায় শ্রমিক আবাসে শৌচাগারও নেই বললেই চলে। ২০০৯ সালে বাগিচায় বৈদ্যুতিকীকরণের আবেদন হয়েছিল। ২৬.১২.২০১১ সালে কোটেশন মানি জমা দেবার পর ০১.০১.২০১২ তে স্ট্যান্ডার্ডাইজেশনের প্রক্রিয়া শেষ হয়।

বাগিচায় একটি হাসপাতাল থাকলেও ক্ষেত্রসমীক্ষার সময়ে একজনও রোগী ছিল না। তাছাড়া সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার ফলে কাউকে পাওয়া যায়নি। সমীর কেরকেট্টা, বিশু হাঁসদা এবং বাগানের অস্থায়ী চৌকিদার লছমন সোরেনের কাছ থেকে জানা গেল মেল ওয়ার্ড ফিমেল ওয়ার্ডও আছে। বেডও আছে ভাঙাচোড়া হলেও বেশ কয়েকটি। পাংচার হয়ে যাওয়া, জানালার শার্সিবিহীন একটি অ্যাম্বুলেন্সও নজরে পড়ল। সমীর জানাল হাসপাতালে কোনও পরিষেবাই দেওয়া হয় না, ইনডং প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সবাইকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের এমবিবিএস ডাক্তারও ছিলেন বাগিচায় জানা গেল। তবে বেশ কিছুদিন হল ছুটিতে থাকায় ক্ষেত্রসমীক্ষার সময়ে তাঁকে পেলাম না। বাগিচায় দু'জন প্রশিক্ষিত নার্স আছে, এদের মধ্যে একজন মিডওয়াইফ। একজন করে হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে। কিলকট চা-বাগিচায় পর্যাপ্ত ওষুধ সরবরাহ হয় না। এবং ওষুধের তালিকা স্টক অনুযায়ী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নোটিশ বোর্ডে দেওয়া হয় না বলে শ্রমিকদের অভিযোগ।

কিলকট বাগানে অ্যাম্বুলেন্সের ভগ্নদশা

> কিলকট চা-বাগিচায় একটি হাসপাতাল থাকলেও ক্ষেত্রসমীক্ষার সময়ে একজনও রোগী ছিল না। তাছাড়া সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার ফলে কাউকে পাওয়া যায়নি। মেল ওয়ার্ড ফিমেল ওয়ার্ডও আছে। বেডও আছে ভাঙাচোড়া হলেও বেশ কয়েকটি। পাংচার হয়ে যাওয়া, জানালার শার্সিবিহীন একটি অ্যাম্বুলেন্সও নজরে পড়ল।

উন্নত মানের পথ্য সরবরাহ করা হয় না এবং নিয়মিত ডায়েট চার্ট অনুসরণ করা হয় না। মেটারনিটির সুবিধা পাওয়া নারী শ্রমিকদের নিকটবর্তী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অথবা মহকুমা শহর মালবাজারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

বাগানে ক্যান্টিন নেই। ভরতুকি দেওয়া হয় না। খাদ্যদ্রব্যের বা সামগ্রীর দাম বোর্ডে দেওয়া হয় না। বাগিচায় ক্রেশের সংখ্যা ২টি। পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা নেই। ক্রেশে শৌচাগার নেই। দুধ, বিস্কুট বা পুষ্টিকর খাবার ক্রেশের শিশুদের সরবরাহ করা হয় না। ক্রেশে নিয়মিত পোশাক দেওয়া হয় না। পানীয় জল অস্বাস্থ্যকর এবং সময়ে সময়ে ব্যবহারযোগ্য নয়।

ক্রেশে মোট অ্যাটেনডেন্ট ৪ জন। কিলকট চা-বাগিচার লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার নীলাদ্রি ব্যানার্জী ০১.০৩.২০১২ সালে কর্মক্ষেত্রে যোগদান করেন। বাগানে কার্যত শ্রমিক কল্যাণসাধনে কোনও ভূমিকা নেই বলে অভিযোগ ট্রেড ইউনিয়নগুলির নেতৃত্বের।

কিলকট চা-বাগিচায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। বাগিচা সংলগ্ন উচ্চবিদ্যালয় মোটামুটি দূরত্বে। বিদ্যালয়ের নাম চালসা গয়ানাথ উচ্চতর বিদ্যালয় এবং মেটেলি হাইস্কুল। দুটি বাংলা মিডিয়াম এবং একটি শ্রমিক-সন্তানদের বিদ্যালয়ে নেওয়ার জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা আছে। যানবাহনের সংখ্যা একটি বাস। বাগানে বিনোদনমূলক ক্লাব এবং খেলার মাঠ আছে। কিলকট চা-বাগিচায় বাৎসরিক বোনাসের হার ২০ শতাংশ। মোট শ্রমিক ১২৭৪। গড়ে বছরে ৫০ লক্ষ টাকা বোনাস প্রদান বাবদ ব্যয় করা হয়।

কিলকট টি গার্ডেনে ডানকানস কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের বিনিয়োগ করা টাকা প্রভিডেন্ড ফান্ড খাতে জমা নিয়মিত করে না। শ্রমিক বরাদ্দ প্রায় ২৩ লক্ষ টাকা, মালিকপক্ষের বরাদ্দ প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা এখনও বকেয়া বলে অভিযোগ। বাগিচায় মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রভিডেন্ড ফান্ডের পুরো অর্থই তারার আত্মসাৎ করছে। বকেয়া প্রভিডেন্ড ফান্ডের মোট অর্থ কত তা জানা না গেলেও ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের অভিযোগ অনুযায়ী প্রায় ৫ লক্ষ, তাদের অভিযোগ মজুরি চুক্তি অনুযায়ী দেওয়া হয় না। শ্রমিকদের মজুরি বকেয়া থাকে প্রায়শই। রেশন বকেয়া থাকে মাঝে মাঝে। শ্রমিকদের জ্বালানি/চপ্পল/ছাতা/কম্বল নিয়মিত সরবরাহ করা হয় না। বকেয়া মজুরির এরিয়ার দিতে গড়িমসি করে কর্তৃপক্ষ। বিগত অর্থবর্ষে গ্র্যাচুইটি বাবদ বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ প্রায় ৫ লক্ষ টাকা যা ৩৫ জন শ্রমিককে প্রদান করা হয়েছে। বছরে গড়ে ৩০-৩৫ জন শ্রমিক গ্র্যাচুইটি পেয়ে থাকেন। শ্রমিকদের গ্র্যাচুইটির অর্থ প্রায়শই বকেয়া থাকে। এমনকি মৃত্যুও হয়ে যায় অনেক শ্রমিকের। তা-ও তারা গ্র্যাচুইটি পায় না বলে অভিযোগ।

অবশেষে সার্কিট বেঞ্চের কাজ শুরু হচ্ছে!
জলপাইগুড়ির ১৫০ পূর্তিতে উপহার!!

উত্তরপক্ষ

প্রশান্ত নাথ চৌধুরী

দেড়শ বছরের এক উদাসীন শহর জলপাইগুড়ি। জেলাকে কেটে ছোট করে দেওয়া হয়ত ভৌগোলিক কারণে একান্ত জরুরি ছিল কিন্তু সংলগ্ন মহকুমা সংযোজিত হল না আজও— তবু সবাই চুপচাপ। রাজগঞ্জ ব্লকের জন অধ্যুষিত এলাকা জেলা থেকে প্রায় বাইরে, তবু এই শহর একেবারে নিশ্চুপ। শহরের ৭-৮ কিলোমিটার দূরে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন, বেশিরভাগ দূরপাল্লার ট্রেন এই স্টেশনে দাঁড়ায় না— দু'-চার জন আড্ডায় চিৎকার করে, তারপর মিইয়ে যায়। ১০ নভেম্বর ২০১৭ থেকে ৩১ জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত রোড স্টেশনে পদাতিক এক্সপ্রেস থামত, পয়লা ফেব্রুয়ারি থেকে তা বন্ধ হয়ে গেল অজ্ঞাত কারণে, নাগরিকরা কিন্তু ভাষাহীন। যুগ অতিক্রান্ত এখানে চা বিক্রির অকশন কেন্দ্র হয়েছিল— তা এখন কাজ করে না, তাতে এই শহরের কোনও হেলদোল নেই। শহরের মাঝে প্রবাহিত করলা নদী নাগরিক সভ্যতার চাপে, আবর্জনা ও বর্জ্যের ভারে এখন বন্ধ্যা নালা। নাগরিককুল নীরব নিশ্চুপ। রাতে দূরপাল্লার সরকারি বাস শহরের বাইরের (বাইপাস) রাস্তা দিয়ে ছুটে যায় অথচ মাত্র কয়েক কিলোমিটার বেশি দৌড়ালে টার্মিনাস ছুঁয়ে যাওয়া যায়— কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। চা কোম্পানিগুলোর হেড অফিসগুলো ধীরে ধীরে শহর ছেড়ে চলে গেল— মাঝ বয়সে কত মানুষ জীবিকাচ্যুত হল, কিন্তু শহর নির্বিকার।

অথচ এই শহরের আপামর বৃদ্ধবনিতা বিগত নব্বই দশকে একযোগে রাজনীতির উর্দ্ধে উঠে গর্জন করে উঠেছিল, ধাক্কা লেগেছিল কলকাতার মহাকরণে, ঝনঝনানি শোনা গিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। দাবি ছিল কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ স্থাপন করতে হবে। শহর স্তব্ধ করে বাচ্চা-বুড়ো, স্থানীয় ক্লাব, রাজনৈতিক দলগুলো, ছাত্রছাত্রীরা বিশাল মিছিল বার করে সার্কিট বেঞ্চের দাবিতে। এদিকে একই দাবিতে শিলিগুড়িতেও আন্দোলন শুরু হয়। শোনা যায় এই দাবি প্রথম উঠেছিল ১৯৬৩ সালে। তবে ১৯৬৯ শালের শুরুতে প্রয়াত নরেশ চক্রবর্তীর বাড়িতে এক বিকেলে কিছু বিশিষ্ট মানুষকে জলপাইগুড়িতে সার্কিট বেঞ্চের ব্যাপারে আলোচনা, আবছা মনে পড়ে।

নব্বই দশকের শুরুতে সেই আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে ১৯৯৩ সালে কলকাতা হাইকোর্টের তিনজন মহামান্য বিচারক পরিকাঠামো ইত্যাদি পরিদর্শনের শহরে আসেন। উত্তেজনায় ও শ্রদ্ধায় সমস্ত শহর রাস্তায় নেমে এসে বিচারপতিদের সম্মান জ্ঞাপন করেছিল। ক্লাব, ব্যবসায়ী সমিতিগুলো এবং বার অ্যাসোসিয়েশন ও নাগরিকবৃন্দের এই যৌথ প্রয়াস সঙ্গে তৎকালীন প্রশাসনের অনবদ্য ভূমিকা বিফলে যায়নি। ১৯৯৪ সালে কলকাতা হাইকোর্ট ঘোষণা করে— জলপাইগুড়িতে কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ স্থাপিত হবে। সেদিন সারা শহর উৎসবে মেতে উঠেছিল— অকাল দিওয়ালি যাপন করেছিল মানুষ। সার্কিট বেঞ্চ দাবি আদায় সমন্বয়কারী সংগঠনের নেতা কমলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় একান্তে বলেছিলেন 'হয়ত দেরি হবে তবে সার্কিট বেঞ্চ হবেই'। দিনের পর দিন জলপাইগুড়ি জেলা আদালত বন্ধ করে, আদালতের প্রবেশ পথে ম্যারাপ বেঁধে রাতদিন অবস্থান বিক্ষোভ চলেছিল। সমস্ত গণসংগঠন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। হাইকোর্ট এই বিক্ষোভ অবৈধ ঘোষণা করেছিল— জেলাশাসক শ্রী রঞ্জিত (আই.এ.এস.), শ্রী ত্রিপুরারী (এস.পি.), শ্রী প্রশান্ত চন্দ (আই.সি.), শ্রী দেবপ্রসাদ রায়, শ্রী মুকুলেশ সান্যাল ও আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছিল। পরবর্তীতে মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট তাদের জামিন মঞ্জুর করে।

আশা করা হয়েছিল জলপাইগুড়ি স্টেশন রোড সংলগ্ন জেলা পরিষদের ডাকবাংলোতে অস্থায়ীভাবে সার্কিট বেঞ্চের কাজ শুরু হবে। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে ডাকবাংলোকে ভেতর-বাইরে আদালতের রূপ দেওয়া হল, বিচারকদের অস্থায়ী আবাস হিসেবে সার্কিট হাউস ও তিস্তা ভবনকে সাজানো হল, বারংবার রাজ্য থেকে পরিদর্শন করা হল। ইঞ্জিনিয়ার ও স্থানীয় প্রশাসন অভাবনীয় তৎপরতা দেখাল— কিন্তু সার্কিট বেঞ্চ চালু হল না। অবশেষে জানা গেল সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী পরিকাঠামোর কাজ শুরু না হলে— অস্থায়ীভাবেও সার্কিট বেঞ্চে চালু করা সম্ভব নয়। ন্যাশনাল হাইওয়ের পাশে শহরের কাছেই পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জমিদারপাড়া অঞ্চলে প্রায় ৪৫ একর জমি নির্দিষ্ট বেঞ্চের জন্য অধিগ্রহণ করা হয়— তাও একযুগ অতিক্রান্ত। ইতিমধ্যে হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতিগণ ও আধিকারিকরা বার কয়েক শহরে এসেছেন। প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। অধিকৃত এলাকা বিপুল ব্যয়ে ঘেরা হয়েছে— তাও কিছু জায়গায় জীর্ণ, কিন্তু অস্থায়ী আদালত চালু হয়নি। এক সময়ের তরুণ নাগরিকরা যারা সেদিনের আন্দোলনে-মিছিলে প্রথম সারিতে ছিলেন তারা আজ প্রৌঢ়, হতাশায় নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা আলাপচারিতায় বলেন— 'হাইকোর্টের অস্থায়ী বাড়িটা পুনরায়

প্রস্তাবিত সার্কিট বেঞ্চের জন্য প্রাচীর ঘেরা এলাকা

ডাকবাংলোতে রূপান্তরিত হোক। তাহলে শহরের বিয়ে বাড়ি ভাড়ার একটা স্থায়ী পরিকাঠামো হতে পারে'। এখন পূর্ত দপ্তর বাড়িটির নিয়মিত পরিচর্যা করে— আর ডিউটিরত পুলিশকর্মীর বিশ্রামের একটা ব্যবস্থা হয়। অত্যন্ত দামী আসবাবপত্র, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ইত্যাদির বর্তমান হাল চেষ্টা করেও দেখতে পারিনি— প্রহরারত কর্মীরা অনুমতি দেয়নি। পূর্তদপ্তর নাকি বারংবার সিভিল ওয়ার্কের নক্‌শা বানিয়েছে— তাতে একাধিকবার বদল করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ২০১৮ সালের প্রায় শুরুতেই খবর পাওয়া গেল— পূর্ত দপ্তরের নক্‌শা অনুমোদিত হয়েছে এবং প্রায় ৩৫২ কোটি টাকার হাইকোর্টের ইমারত তৈরির টেন্ডার প্রক্রিয়া সরকার শুরু করেছে, দু'-তিন মাসে তা সমাপ্ত হবে।

সার্কিট বেঞ্চের অস্থায়ী ভবন

এবার কাজ এগবে

সে এক এলাহি ব্যাপার, প্রায় ৫০০ বর্গ মিটার জায়গা জুড়ে চারতলা বাড়ি তৈরি হবে। থাকবে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কক্ষ, বিশ্রামকক্ষ, সিঙ্গল জাজদের বেশ কয়েকটি বিচারকক্ষ, একাধিক বিচারকের কিছু বিচারকক্ষ, আধিকারিকদের বসার কক্ষ, লাইব্রেরি, ল-ইয়ারদের বসার কক্ষ, ল-ইয়ার্স ক্লার্কদের বসার কক্ষ, প্রচুর টয়লেট এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কক্ষ। তৈরি হবে ১৫ জন বিচারপতির বাংলো এবং প্রধান বিচারপতির জন্য একটি বেশ বড় আকৃতির বাংলো।

আশির দশকের শেষে এবং নব্বই দশরে প্রথম দিকে আন্দোলন চালাচ্ছিলেন শহরের আম নাগরিক এবং জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশন। ২০০৭ শালের ১০ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন জেলা শাসক সার্কিট বেঞ্চের জমি বিচার বিভাগের সচিবকে হস্তান্তর করেছিলেন। তারপর পূর্তবিভাগকে নকশা তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়। নানা কারণে নক্‌শার বেশ কয়েকবার পরিবর্তন করা হয়। মাননীয় বিচারকরা ইতিমধ্যে কয়েকবার এসেছেন সরেজমিনে অবস্থা যাচাই করেছেন। কিন্তু অস্থায়ী কোর্ট চালু করা সম্ভব হয়নি।

অনেকেই বলেন কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ জলপাইগুড়িতে হলে শুধুমাত্র আইনজীবিদের রোজগার বৃদ্ধি পাবে। আম জনতার কী লাভ? এটা ঠিক বহু নাগরিক সারা জীবনে হয়ত নিজস্ব মামলায় জেলা কোর্ট বা হাইকোর্ট পর্যন্ত যাননি। তবে যারা বিচারের প্রার্থনায় উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক জেলাগুলি থেকে কলকাতায় গিয়ে হাইকোর্টে নিজের কেসের ব্যাপারে তদ্বির তদারকি করেন— তাদের অমানুষিক ঝামেলা দিনের পর দিন সহ্য করতে হয়। প্রথমত ট্রেনের টিকিট অর্থাৎ রিজার্ভেশন পাওয়া গেলে ভাল না পেলে জেনারেল বগিতে রাত জেগে যাত্রা। হোটেলের খরচ, কোর্টেও নানা রকম খরচ করতেই হয়। উকিলবাবু ও তার সহকারীর ফি কিন্তু দিনে দিনে বাড়ছে। যতবড় উকিল তত বেশি ফি, এটাই স্বাভাবিক। তারপরেও ডেটের পর ডেট পরে, তার পিছনে অবশ্যই আইনগ্রাহ্য যুক্তি থাকে। শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে আমি প্রবীণ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী বন্ধুবর অলোক কুমার চক্রবর্তীর একবার শিয়ালদহ প্ল্যাটফর্মে অসুস্থ হয়ে শুয়ে পড়ার কথা জানি। জলপাইগুড়িতে সার্কিট বেঞ্চ স্থাপিত হলে এলাকার মানুষজন কাজ পাবেন। হোটেল ও পরিবহণ ব্যবসার প্রভূত উন্নয়ন ঘটবে। সাইবার কাফে, জেরক্সের দোকান, স্ট্যাম্প ভেন্ডার থেকে শুরু করে চা ও পানের দোকান বহু মানুষের কর্মসংস্থান ঘটাবে। আইনের পেশার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত আইনজীবিদের চেম্বারে বহু জুনিয়র কাজ পাবে। আইন শিক্ষার প্রতি ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ অবশ্যই বাড়বে। বর্তমানে যারা আইন পাশ করেন, শোনা যায় তাদের ৩০ শতাংশ মাত্র পেশাগতভাবে আইন ব্যবসায় যোগ দেন। জেলা কোর্টগুলোতে দেখবেন এই নেতিবাচক অবস্থার মধ্যে বহু তরুণ তরুণী আইন ব্যবসাকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করে লড়াই করছেন। ডিজিটাল প্রজন্মের তরুণতরুণীরা প্রত্যাশা করছেন— সার্কিট বেঞ্চ চালু হলে তাদের জীবন জীবিকার নতুন দিগন্ত উন্মোচন হবে।

আইন কলোনি

প্রায় সাড়ে ছয় হাজার বর্গমিটার এলাকা জুড়ে ৭২টি স্টাফ কোয়ার্টার তৈরি হবে জি-৩ মডেলে। প্রায় এক হাজার বর্গমিটার অডিটোরিয়াম তৈরি হবে মূল আদালত ভবনে। ৩০০ জনের বসার বন্দোবস্ত থাকবে এই শীততাপ নিয়ন্ত্রিত অডিটোরিয়ামে।

২০০টি গাড়ির পার্কিংয়ের ব্যবস্থার সঙ্গে আরও ৭২টি গাড়ি রাখা যাবে ঢাকা জায়গায়। গোটা এলাকা থাকবে সিসি টিভির নজরদারিতে। বিদ্যুতের সাব স্টেশন, এয়ার কন্ডিশন প্ল্যান্ট ইত্যাদি এবং একাধিক ওভারহেড জলের ট্যাঙ্ক থাকবে।

আপাতত অস্থায়ী বেঞ্চ চালু হোক না!

নিশ্চয়ই মনে আছে শহরবাসীর, ১ সেপ্টেম্বর ২০১২ তে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালিন মুখ্যমন্ত্রী পদব্রজে কিং সাহেবের ঘাটে নির্মিত ইন্সপেকশন বাংলো থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে বিশ্ববাংলার ক্রীড়াঙ্গনে পৌঁছলেন। পথের দু'ধারে অগণিত মানুষ তাকে শুভেচ্ছা জানালেন। সে কি উন্মাদনা। সেদিন ওনার সঙ্গে ছিল মাননীয় শ্রীযুক্ত জয়নারায়ণ প্যাটেল, তৎকালীন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। আসলে সেদিনের অনুষ্ঠান ছিল সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী পরিকাঠামো নির্মাণের শুভ সূচনা। আমি নিজে সার্কিট বেঞ্চের দাবিতে সংগঠিত বহু মিটিং মিছিলে নীরবে অংশগ্রহণ করেছি। তবে ওই ১ সেপ্টেম্বরের আবেগ ছিল আকাশছোঁয়া।

কিছুদিন আগে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পাশাপাশি বসে কমল কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় একটা গভীর কথা হালকা চালে বলেছিল— 'কেন্দ্র রাজি, রাজ্য রাজি, শাসক পক্ষ-বিরোধী পক্ষ রাজি, জেলাক কোর্ট-হাইকোর্ট রাজি, অর্থাৎ সবাই সার্কিট বেঞ্চ জলপাইগুড়িতে স্থাপনের পক্ষে— তাহলে দেরি কেন?' তবে এই মুহূর্তে শহরবাসী আশা করে স্থায়ী পরিকাঠামোর কাজ যখন শুরুই হল— তখন প্রস্তুত করে রাখা অস্থায়ী পরিকাঠামোয় সার্কিট বেঞ্চের কাজ শুরু হোক না। তাহলে কলকাতা থেকে কাগজপত্র অনেকটাই এখানে চলে আসবে এবং স্থায়ী পরিকাঠামো তৈরি হলে কাজ চালু করতে বিলম্ব হবে না। উত্তরবঙ্গের মোকদ্দমায় জড়িত মানুষের সমস্যা কিছুটা লাঘব হবে। আমরা হয়ত আগামী প্রজন্মকে বলতে পারব অস্থায়ী পরিকাঠামো বিফলে যায়নি।

চায়ের বুটিক আড্ডায় ভিড় বাড়ছে ফিরছে কি তরাই-ডুয়ার্স চায়ের গ্ল্যামার?

মহানগরীর ধাঁচেই উত্তরের ছোট শহরগুলিতেও একের পর এক খুলছে আধুনিক সজ্জার চায়ের পানশালা। পুরনো রংচটা ঘুপচি চা-দোকানের কনসেপ্ট আজ প্রায় গায়েব, তকতকে পরিবেশে প্রিয়জনদের সাথে কিছু সময় অতিবাহিত করার অভ্যেস বাড়ছে মফস্বলের অলস জীবনেও, ফারাক একটাই, এখানে সঙ্গে থাকে নিজভূমিতে উৎপাদিত চায়ের অতুলনীয় আস্বাদ গ্রহণ। এইসব চা-বার কিংবা চা-পার্লারে কোথাও কোথাও বাণিজ্যিক সাফল্য আসতে শুরু করেছে, কর্মসংস্থানও ঘটছে সন্দেহ নেই। কিন্তু আজকের সমস্যা জর্জরিত উত্তরের চা শিল্পের খুইতে বসা গ্ল্যামার বা গৌরবের আদৌ কি পুনরুদ্ধার ঘটছে এতে? ইকো পর্যটনের মূল শর্ত যদি হয় নিজস্ব প্রাকৃতিক সম্পদ ও ঐতিহ্যের গৌরবান্বিত সংরক্ষণ, তবে এইসব চা-বুটিকগুলির আদপেই কোনও অবদান থাকছে কি? তুখোর ইন্টিরিয়র কিংবা আঁতলামি থাকুক, সুদৃশ দামী পেয়ালায় চা-বৈচিত্র্যের ঘনঘটা হোক, দিলখোলা আড্ডা বা দিল বিনিময়ও হোক, কিন্তু ‘এক কাপ চা পান মানেই উত্তরের চা-শিল্প রক্ষায় যোগদান’ এমন সোজাসাপ্টা বার্তা কি তাঁরা পৌঁছে দিতে পারছেন ঘরে বাইরে? তারই অনুসন্ধানে নেমেছে ‘এখন ডুয়ার্স’।

উত্তরে চায়ের আড্ডাপীঠ শিলিগুড়ি

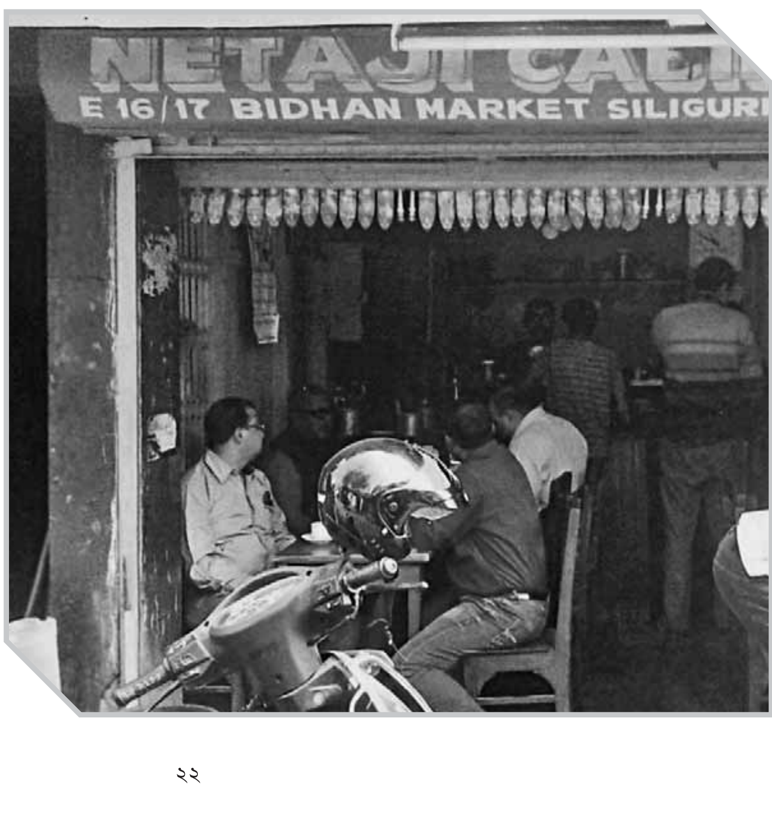

আমি চা বিশেষজ্ঞ, গবেষক, চা-কর নই তবে চায়ের রসে আমি সারাক্ষণ মজে থাকি। প্রতিদিনের আড্ডায় চায়ে চুমুক না দিলে এতটুকু ‘এনথ্যু’ পাই না। শৈশবকাল থেকে চায়ের সঙ্গে মিল মহব্বৎ। মনে হয় হাতেখড়ি আর চায়ের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক তখন থেকেই। ছোটবেলায় আমাদের বাড়িতে ব্রুকবন্ড, লিপটন, নামীদামী চা আসত। মস্ত বড় কেটলি, কয়লা না হলে লকড়ির উনুনে চাপানো হত। অবিরাম চা হচ্ছে। যৌথপরিবারে কখনও মা, কাকিমা, জেঠিমারাই চা তৈরি করতেন। যথারীতি আমিও প্রসাদ পেতাম। তখন সুগন্ধি চা বা গুণাগুণ নিয়ে মাথাব্যথা ছিল না। দুধ, চিনি দিয়ে সিটিসি খাওয়া। এখন দুটোই বাদ। গ্রিন টি নামক বস্তুর সঙ্গে পরিচয় ছিল না। উপকারিতা, অপকারিতা নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তাভাবনা ছিল না। ধীরে ধীরে চা আমার অস্থিমজ্জা রক্তমাংসে জড়িত হয়ে যায়। কাক ডাকার সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেলেই আমি চা চা করতে থাকি।

চা-কে ঘিরে আড্ডা তরাইয়ের ছোট্ট জনপদে আমার দেখা, বলা যায় চুপি চুপি ঢুঁ মারা শম্ভু কেবিনে। সেবক রোডে দেবদারু

গাছের আড়ালে শম্ভু কেবিনে জগদীশদার ম্যাজিক চা, সঙ্গে হাতে বাঁধা বিড়ি। লুকিয়ে চুরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ার এক নিষিদ্ধ রোমাঞ্চ অনুভব যে হত আজ অকপটে স্বীকার করছি। চার পয়সা পাঁচ পয়সায় এক গ্লাস। শম্ভু কেবিন থেকে শ্রীভবনের ভিতরে জ্ঞানদার চা ছিল বিখ্যাত। হিলকার্ট রোডে সুবিশাল লম্বা কাঠের দোতালা ভিতরে জাতীয় সমবায় ভাণ্ডার প্রেস। মালিক কালীপদ ধর। এখান থেকেই প্রকাশিত হত সাহিত্য সংস্কৃতি সংবাদ বিষয়ক মাসিক পত্রিকা মহানন্দা, চলতি কথা। পঞ্চাশের দশকের শুরু। জবর আড্ডা হত 'মহানন্দা', 'কথা কলম', চলতি কথাকে ঘিরে। বিমলদা (চোমং লামা), নৃপেনদা (যুগান্তর পত্রিকার সাংবাদিক), দীনেনদা (আনন্দবাজার পত্রিকার সাংবাদিক), হরেন ঘোষ, প্রদ্যোৎ সরকার, বিমলেন্দু দাস, বিজন চৌধুরী, অরবিন্দ কর, অজিতেশ ভট্টাচার্য। পরবর্তীকালে শ্রী আর্য প্রেস থেকে 'সংঘর্ষ' সম্পাদক বসন্ত ঘোষ এবং থানার উল্টোদিকে সাপ্তাহিক সৈনিক। হরিপদ ভট্টাচার্য, বিমল ঘোষ আরও অনেকে যুক্ত ছিলেন। সকাল থেকে রাত ঘনঘন চা আর রকমারি আড্ডা। এখানে সাহিত্যের চেয়ে রাজনীতির কুটকচালিটাই বেশি হত। আর আড্ডার ফোয়ারা ছিল মিত্র সম্মিলনী। নিচে জলযোগ। 'পরিচালনায়' হীরালাল ঘোষ। ওই আড্ডায় বয়সগত কারণে যাবার বা প্রবেশের অনুমতি ছিল না। বাবার বন্ধুরা যেমন সমর সরকার, লকু ডাক্তার, অতীন বোস, চিত্তদয়াল চক্রবর্তী, হাবু সরকার, শান্তি ভট্টাচার্য অনেকে আসতেন। শতবর্ষ প্রাচীন মিত্র সম্মিলনী শুধু আড্ডা চায়ের আসর সাংস্কৃতিক জগতের পীঠস্থান। অতীতের সেই রমরমা পরিবেশ নেই। লজঝর হলেও উদয় দুবে বুকে জাপটে ধরে রেখেছে। গেলেই পরে চা ও টা হবেই হবে। আর আড্ডা হি কেবলম্। সন্ধ্যায় তাসারুদের আড্ডা আর বিবিধ গালগল্প।

শিলিগুড়িতে চা-কে ঘিরে লাগাতার আড্ডা হত টাউন স্টেশনে মেসার্স ডি সোরাবজীর রিফ্রেসমেন্ট রুমে। ইংরেজ জমানায় ছিল ঝকঝকে তকতকে চেহারা। কালা চামড়ার লোকজনদের প্রবেশ অধিকার ছিল না। আমি দেখেছি পড়ন্ত বেলায় ভাঁটার সময়। ভেতরে ঢুকলে মনে হবে কোথায় এলাম কী দারুণ আভিজাত্যপূর্ণ চায়ের সাজসরঞ্জাম। ফায়ার প্লেস, তেমনই সেগুন, শিশু কাঠের টেবিল-চেয়ার। উর্দিপরা বাবুর্চি, খানসামা। চোখ জুড়ানো পরিবেশ। পেছনে ছিল স্পাইরাল লোহার সিঁড়ি। এখানে একদা আমাদের নিয়মিত আড্ডা হত। গল্প-কবিতা পাঠের আসর। এই ক্যান্টিনেই আমার সঙ্গে পরিচয় এবং বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে স্বামী চাখাওয়ানন্দজীর সঙ্গে। রেলের মেসে থাকতেন। অকৃতদার। বলতেন সোরাবজীর ক্যান্টিনে চা খেলে অন্যত্র খেতে ইচ্ছে করবে না। দুপুরে খাওয়াদাওয়া কিন্তু করতেন বাস্তুহারা হিন্দু হোটেলে।

শিলিগুড়ির আদালত প্রাঙ্গনে বানোয়ারির কাঠের পাটাতনযুক্ত কাঠের বেড়া, টিনের ছাউনি দেওয়া হেরিটেজ চা বানানেবালা দোকান অভিতক ইয়াদ হ্যয়। সপ্তম-অষ্টম শ্রেণি থেকে বানোয়ারির চা দোকানের আড্ডাতে মগ্ন থাকার

> আশ্রম পাড়ায়, এঞ্জেলা স্কুলের বিপরীতে সগৌরবে দাঁড়িয়ে মৌতাত। বহিরঙ্গ থেকে অন্দরমহলে প্রবেশ করলে মনে হবে বিদেশ বিভুঁইয়ে এলেন। ফাটাফাটি অ্যাম্বিয়েন্স। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতেই দেখবেন শ্রীমান অভির সেরা কার্টুন। গদি-বালিশ আর চা আড্ডা। বিকেল হতেই নরকগুলজার। স্মোকিং জোনও রয়েছে।

স্মৃতি এখনও যেন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে। আহা চার পয়সার চা, দু' আনার শিঙারা, রসগোল্লা। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত ম্যারাথন আড্ডা। বানোয়ারির পার্মানেন্ট খদ্দের ছিলেন অমূল্যবাবু স্যার। মাসকাবারি ব্যবস্থা। পকেটে পয়সা না থাকলে বলতাম পিছে মানে পরে দিব। বানোয়ারির সাকরেদ কানাহরি (ট্যারা চোখ) বলত খোকাবাবু এ্যয়সা মত কিজিয়ে। লুকিয়েচুরিয়ে বিড়ি খেতাম। হলিনদা, রবিদা বিনে পয়সায় বিড়ি দিত। তখন এক পয়সায় পাঁচটা বিড়ি পাওয়া যেত। কানা পয়সার দাম ছিল। বানোয়ারির মতনই বিখ্যাত ছিল জয়হিন্দ, মুসারাম। প্রায় দেড়শ বছর ধরে মুসারাম চলছে তবে সেদিনের আড্ডাটা স্তিমিত।

কবি, লেখক, প্রাবন্ধিকদের আড্ডাটা অনেক সময় শ্যাওলার মতন ভেসে বেড়াত। 'আসমুদ্র হিমাচল' নামে একটি সাহিত্য সংস্কৃতিমূলক পত্রিকা প্রকাশিত হত। আমি ছিলাম তার সভাপতি। সম্পাদনায় নারায়ণ ভট্টাচার্য, নির্মল মিত্র। যুক্ত ছিলেন অনেকে ধ্রুবজ্যোতি, বিমান, আকাশবাণীর অশোক বসু মল্লিক, দেবব্রত, অসীম বেজ, স্বর্ণকমল চট্টোপাধ্যায় লিখতেন। আমাদের জম্পেশ আড্ডা ছিল আনন্দদার আপ্যায়নে। উত্তেজনার আগুন পোহাবার কয়েক বছর বাদে কে কোথায় ছিটকে গেল। অনেকে চিরকালের মতন চলে গেল। খুবই অকালে চলে গেল নারু।

চায়ের নেশা সঙ্গে তেলেভাজা, মুড়ি-চানাচুর প্রায় নেশার মতন আড্ডা হত দাদাঠাকুরের প্রেসে। আমাদের সবার প্রিয় প্রদ্যোৎ সরকার। অর্ধ সাপ্তাহিক হিমাচলবার্তা। ঘনঘন চা আসত উপর থেকে না হলে দলবেঁধে হেঁটে চলো পাকুরতলায়। বিনয়বাবু, সুরঞ্জনবাবু, বিবাদভঞ্জনবাবু, বল্টু, প্রবীর, মনোজ, রথীন, নারু কত নাম বলব।

চা নিয়ে জবর আড্ডা হত বিবেকানন্দ মিনি মার্কেটে উপেন দাশগুপ্তের ছোট্ট দোকানঘরে। ক্যামেরা, ঘড়ি সারানোর পেশা থাকলেও মানুষটা ছিলেন অমিত জ্ঞানভাণ্ডারের অধিকারী। প্রচুর পড়াশোনা। বন, বন্যপ্রাণ থেকে অর্কিড, ভেষজগাছ, বেড়ানোর হালহদিস আর সেই সঙ্গে ঘনঘন চা, বিড়িতে টান। শহরের সুশীলসমাজ উঠতি ছেলেছোকরা নিয়মিত ভিড় করত এবং দোকানে পা দিলেই হাঁক ডাক 'তুষারবাবু চা পাঠান'। দিনেরাতে কত কাপ চা খেতেন জানা নেই। বলতেন শরীরটাকে ভাল রাখতে হলে মনে রাখবেন চা আর আড্ডা মাস্ট। মনের সব দীনতা মলিনতা ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে। এমন মজাদার দিলরাজ মানুষ খুব কম দেখা যায়। উপেনদা চলে যাবার পর সেই আড্ডাও নেই। তুষারদাও দোকানের ঝাঁপ চিরতরে বন্ধ করে কোথায় আছেন জানা নেই। মিনি মার্কেটে একদা পরিতোষ চা তৈরি করত আর কবিতা লিখত। দুর্ভাগ্য এখন সে আত্মভোলা হয়ে ঘুরে বেড়ায়। বরং মিনি মার্কেটে অনিল বিশ্বাস ভবনের সামনে যদু মধু হরির চা-দোকানে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে বহু মানুষ চা পান ও আড্ডা দেন। মাঝেমধ্যে আমিও হাজির হই জারুল গাছের ছায়ায় চায়ের ঘটঘটির মধ্যে। ছাত্র, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা হয়। বর্তায় ফাল্গুনা হাওয়া, একটু অসুবিধা।

টেলিকম ভবনের পাশের গলিতে চায়ের আড্ডা যেন জনজোয়ার, বসার জায়গাই পাবেন না। এত হুলুস্থুলু ভিড়। কে যে কোন প্রান্ত থেকে চলে আসে জানা নেই। চলার পথে আমিও আড্ডায় জমে যাই। চেনা অচেনা মুখের মিছিলে হারিয়ে যাওয়া। কেউ কেউ জিগায়— 'স্যার আপনি কি এই চায়ের আড্ডায় নিত্য আসেন?' আসি, ফুরসৎ পেলেই। চায়ের সঙ্গে যেমন টা তেমনই পরম আনন্দের ভোজপুরী আড্ডা। জয়গুরু বলে কেউ একটা গুঁতো দিয়ে চলে গেল। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি আমায় স্কুলজীবনের বন্ধু বিশ্বকবিরাজ।

চা পানের হিসাব নাইরে। চা-টা উপলক্ষ আড্ডা হি কেবল্‌ম। দিল খুশ আড্ডা। মানুন চাই না মানুন বাঙালির মতন আড্ডাবাজ আর চা-খোর দ্বিতীয় কেউ ভূমণ্ডলে আছে বলে মনে হয় না। খাঁটি চায়ের নির্যাস, ফ্লেভার টি বাঙালিদের প্রথম পছন্দ। তবে আমার ব্যক্তিগত ভাবনা যদি কলকাতার মতন মাটির ভাড়ে চা-টা পরিবেশন হত তাহলে ভাল হত।

শিলিগুড়িতে শুধুমাত্র চায়ের রসনা নয়, সেই সঙ্গে আধুনিক পোচ, ওমলেট, হাফবয়েল, টোস্ট যদি খেতে হয় আর জমিয়ে আড্ডা দিতে হয় তাহলে আপনাকে আসতেই হবে 'নেতাজি কেবিন'-এ। বিপদভঞ্জন থেকে মন্টুদা, এখন ধরে রেখেছে প্রণব। ষাট বছরের বেশি বই কম নয় নেতাজি কেবিনের বয়স। কাক ডাকার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপ খোলে, আর ভাটি তো সারাক্ষণ জ্বলে। অতি প্রত্যুষে প্রাতঃভ্রমণকারী, লাফিং

"শিলিগুড়িতে শুধুমাত্র চায়ের রসনা নয়, সেই সঙ্গে আধুনিক পোচ, ওমলেট, হাফবয়েল, টোস্ট যদি খেতে হয় আর জমিয়ে আড্ডা দিতে হয় তাহলে আপনাকে আসতেই হবে 'নেতাজি কেবিন'-এ। বিপদভঞ্জন থেকে মন্টুদা, এখন ধরে রেখেছে প্রণব। ষাট বছরের বেশি বই কম নয় নেতাজি কেবিনের বয়স। কাক ডাকার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপ খোলে, আর ভাটি তো সারাক্ষণ জ্বলে। অতি প্রত্যুষে প্রাতঃভ্রমণকারী, লাফিং ক্লাবের মেম্বার হাজির হন তারপর শুরু হয় মিউজিক্যাল চেয়ার রেসের মতন বসার জায়গা দখল।"

ক্লাবের মেম্বার হাজির হন তারপর শুরু হয় মিউজিক্যাল চেয়ার রেসের মতন বসার জায়গা দখল। গোটা পাঁচ-ছ'টি দৈনিক কাগজ হিন্দি-বাংলা-ইংরেজি। তার লেজ মাথা নিয়ে টানাটানি। আমি পার্মানেন্ট মেম্বার। বসার জায়গা না পেলে অনেকে উপরে উঠে পড়েন। নেতাজি কেবিনের গলি দিয়ে একটু গেলেই একদা সুবিখ্যাত ছিল লাহিড়ী কেবিন। চায়ের আড্ডার মাদকতা আর মজলিশি মেজাজ জীবনে ওখানে প্রাণভরে উপভোগ করেছি। আদ্যিকালের বদ্যিবুড়োর মতন ঘর জরাজীর্ণ ধূসর বিবর্ণ টেবিল-বেঞ্চ তেমনই সুবিশাল জলের কলসি। একা লাহিড়ীদা কয়লা ভাঙা, চা বানানো, টোস্ট, ওমলেট তৈরি করত। আড্ডায় সুরসুরি দেওয়া, রাজনীতির সলতে পোড়ানো, নানা জেলার মানুষজনের ভিড়ে গমগম করত। দুঃখ হয় লাহিড়ীবাবু হঠাৎ কী হল দোকান বেচে গৃহবন্দী হয়ে গেলেন। আড্ডাধারীরা ছিটকে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ল। পথেঘাটে হঠাৎ কোনও প্রাক্তন আড্ডাধারীদের দেখা হলে শুনি আমাদের পিঠ চুলকানি সমিতিটা ভেঙে গেল। লাহিড়ী কেবিনের আড্ডাটা আজ আর নেই।

চা নিয়ে আড্ডার সাতকাহন, পাঁচালির শেষ নেই। স্মৃতির ঝুলি যখন হাতরে বেড়াই তখনই যেন জলছবির মতন ভেসে ওঠে ক্যাভেন্টার্স। দার্জিলিংয়ের ল্যাডেন লা রোড (নেহেরু রোড) ধরে ম্যাল যেতে পাশেই গ্লিনারিজ। উল্টোদিকে প্ল্যান্টার্স ক্লাব। খাঁটি সুগন্ধি আসল দার্জিলিং চা তারিয়ে তারিয়ে পান করার মেজাজ ক্যাভেন্টার্সের আলোকিত কিম্বা মেঘকুয়াশা মাখা খোলামেলা দোতলার টেরাসে। কয়েক ঘণ্টা দিব্যি এক পট চা ধীরে ধীরে পান আর জম্পেশ আড্ডা সঙ্গে কিছুটা ব্রেড বাটার না হলে বার্গার, চিজ স্যান্ডুউইচ, হটডগ, তুলতুলে পেস্ট্রি আনিয়ে নিতাম গ্লিনারিজ থেকে। অনেকদিন দার্জিলিংয়ে যাওয়া হয় না। জানতে ইচ্ছে করে সব কি আগের মতনই আছে নাকি বদলে গেছে?

চায়ের আড্ডার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দিল রীতিমতন নব আঙ্গিকে, নতুন ভাবনাচিন্তায়। রীতিমতন সাড়া ফেলেছে উত্তরবঙ্গের সর্বত্র মায় দক্ষিণবঙ্গে। নাম মৌতাত। তিন কন্যার সঙ্গে আরও অনেকের মদৎ পরিশ্রম। মামণি, সোমা সকলেই। পরিবেশন, তৈরি, নানা ধরনের চা। নামকরা চা-বাগান যেমন মকাইবাড়ি, গিদ্দা, গোপালধারা, গ্লেনবার্গ, হরবু— নামের কি শেষ আছে। আশ্রম পাড়ায়, এঞ্জেলা স্কুলের বিপরীতে সগৌরবে দাঁড়িয়ে মৌতাত। বহিরঙ্গ থেকে অন্দরমহলে প্রবেশ করলে মনে হবে বিদেশ বিভুঁইয়ে এলেন। ফাটাফাটি অ্যাম্বিয়েন্স। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতেই দেখবেন শ্রীমান অভির সেরা কার্টুন। গদি-বালিশ আর চা আড্ডা। বসার ব্যবস্থা। কী চা আপনি ভালবাসেন? সবুজ, কমলা, চকলেট, হোয়াইট, স্ট্রবেরি, ওয়াইন টি। লম্বা তালিকা। বই পড়া, বই কেনা, গানবাজনা, খানা খাজানা। বিকেল হতেই নরকগুলজার। স্মোকিং জোনও রয়েছে। একটু আধটু বুদ্ধির ঘটে ধোঁয়া দিতেই পারেন। পরচর্চা, পিঠচুলকানি, হাস্যরোল হতেই পারে। সত্যি বলছি মৌতাত ভীষণ মাতিয়ে দিয়েছে। এখানে ঢুকলেই আমার বয়স কমে যায়। যৌবন ফিরে পাই। ভ্যালেন্সটাইন ডে-তে আমি সটান চলে গেছি মৌতাতে। শহরের কবি-শিল্পী-দার্শনিক-ডাক্তার-অধ্যাপক-আঁতেল-গেঁজেল— সকলের জন্য মৌতাতের দরজা খোলা। মৌতাত থেকে সামান্য হাঁটাপথের দূরত্বে হাকিম পাড়ায় সেইন রোডে আর্ট ও আড্ডার নব সংযোজন চায়ের আড্ডার নতুন পালক। রং-তুলি নিয়ে ছবি আঁকে শিল্পীরা। চায়ের আড্ডার সঙ্গে ছবি দেখার আনন্দ বাড়তি পাওনা। পরবর্তী সময়ে চা নিয়ে সাতকাহন সবিস্তারে লেখার ইচ্ছা রইল 'এখন ডুয়ার্স'-এর পাতায়।

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

চা পানের গুণমানে আকাশ ছুঁতে চায় 'টপ টি হাউস'

'চা ছাড়া আড্ডা আর নুন ছাড়া রান্নার মধ্যে খুব একটা পার্থক্য নেই'। এই জব্বর সত্যটি নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই ঠিক কথা, কিন্তু চা পানের সঙ্গে আড্ডার অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক থাকলেও সেসব আড্ডায় উত্তরের চা নিয়ে কিংবা চা পান নিয়ে আলোচনা হয় না বললেই চলে। বড়জোর চা-টা ভাল কি মন্দ, কোন দোকান থেকে কেনা হয়েছে বা কত দাম তার খোঁজখবর চলে। ভাল চা কি? খারাপ চা কাকে বলে বা কীভাবে ভাল চা তৈরি হয় বা তৈরি করা যায়, এমনকি যে দোকান থেকে চা কেনা হচ্ছে বা খাওয়া হচ্ছে সেই দোকানের সঙ্গে ভাল চায়ের কি সম্পর্ক তা নিয়ে ভাবার তাগিদ খুব কমই দেখা যায়। কিন্তু এক ব্যতিক্রমী এবং অনন্য নজির সৃষ্টি করেছে শিলিগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারের টপ টি হাউস যার জনপ্রিয়তা তরাই ডুয়ার্স ছাড়িয়ে বিভিন্ন দিকে ব্যপ্তি লাভ করেছে সাম্প্রতিককালে।

মিঠু যোশীর কথা দিয়েই শুরু করা যাক। ভেগা মলের ফুড ফেস্টিভ্যালে টপ টি হাউসের অস্থায়ী দোকানে নির্মল এবং উত্তমের সঙ্গে আলাপচারিতার সময়তেই পেয়ে গেলাম মিঠু যোশীকে। দমদমে বাড়ি। এক বছরের ওপর সম্পর্ক টপ টি হাউসের সঙ্গে। পেশাগত কাজে শিলিগুড়িতে ঘনঘনই আসেন শ্রীমতী যোশী এবং শহরের বিভিন্ন কোণে কোণে অবস্থিত টপ টি হাউসের দার্জিলিং টি-এর ফ্লেভার থেকে নিজেকে কোনও মতেও বঞ্চিত করেন না তিনি। তার মতে ন্যায্য দামে উন্নত মানের চা, দোকানগুলির সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকের অমায়িক ব্যবহার, পরিচ্ছন্নতা এবং ক্রেতাদের সঙ্গে সুসম্পর্কই টপ টি হাউসকে আজ এই জায়গায় নিয়ে এসেছে।

ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট গ্রুপের সম্রাট দাশ চৌধুরীর বাড়ি দেশবন্ধু পাড়ায়, সুমন বসাকের ডাবগ্রামে এবং চন্দ্রিমা দে-র বাড়ি রবীন্দ্রনগরে। সকলেই কসমস শপিং মলে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কাজ করছে। ২০১০-১১ সাল থেকেই 'টপ টি হাউসের' আদি দোকানের সঙ্গে সম্পর্ক। নির্দ্বিধায় জানালেন 'টপ টি হাউসের' চা ভাল লাগার দুটো কারণ। প্রথমত এর স্বাদ এবং দ্বিতীয়ত চা খাওয়ার পর ভালো লাগার অনুভূতি। চন্দ্রিমার সঙ্গে তো পারিবারিক সম্পর্কের বন্ধনডোরও রচিত হয়েছে। দীর্ঘদিনের সম্পর্ক টপ টি হাউসের শ্যামা সাহার সঙ্গে। যিনি একাধারে হাউসের কর্ণধার, অন্যদিকে কারোর দিদি, কারোর মাসি— যাঁর স্নেহময়তা 'টপ টি হাউস' পরিবারকে একসঙ্গে একতার মেলবন্ধনে আটকে রেখেছে।

কোচবিহারের বক্সিরহাটের প্রত্যন্ত গ্রামে বাড়ি ছিল 'টপ টি হাউসের' কর্ণধার স্বপন সাহার। পড়াশুনা এবং চাকরি সূত্রে শিলিগুড়িতে আসা স্বপনবাবুর। পিডব্লিউডি-এর দখলীকৃত জায়গা কিনে নিয়ে মাথা গোঁজার আশ্রয়। জ্যাঠতুতো ভাইকেও সঙ্গে করে নিয়ে আসেন তিনি। চা পাতার দোকান দিয়ে ব্যবসা শুরু হয়। দার্জিলিং, ডুয়ার্স, আসামের চা পাতার দোকান প্রায় দেড় বছর চলে। ইতিমধ্যেই ব্যবসার সুবাদে

দার্জিলিং চায়ের গুণগ্রাহী হয়ে ওঠেন স্বপনবাবু এবং সততা এবং সুনামের সঙ্গে চা পাতার ব্যবসা চালাতে থাকেন জ্যাঠতুতো ভাইকে সঙ্গে করে। কিন্তু হঠাৎ করেই মা মারা গেলে ছন্দপতন ঘটে। বক্সিরহাট বাড়ির পাট গুটিয়ে বাবা, চার বোন সকলকে নিয়ে শুরু হয় কঠোর জীবনসংগ্রাম। ইতিমধ্যেই জ্যাঠতুতো ভাইয়ের কলকাতা পুলিশে চাকরি হয়। স্বপনবাবুর বাবা চা পাতার দোকানের পাশাপাশি মুদি স্টেশনারি দোকান চালাতে লাগলেন। ছোট একটি ছেলেও রাখা হল সাহায্য সহযোগিতার জন্য। স্বপনবাবুর বাবার মাইন্ড স্ট্রোক হলে দোকান চালানো নিয়ে সমস্যা সৃষ্টি হয় এবং ছোট বোনের বিয়ের কিছুদিন পরে দোকানের উপর থেকে স্বপনবাবুর বাবার মনোযোগ নষ্ট হয়ে যায়। বাধ্য হয়ে অবশেষে দোকান বন্ধ করে দিতে হয়।

ইতিমধ্যে বিদ্যুৎবিভাগে চাকরিও পেয়ে যান স্বপনবাবু। কিছুদিন দোকান বন্ধ থাকে। কসমস মলের পরিকাঠামোগত কাজ শুরু হলে একশ্রেণির ব্যবসায়ী দোকান কেনা অথবা ভাড়া নেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগে। কিন্তু স্বপনবাবুর মনোভাব ছিল হয় দোকান বন্ধ থাকবে অথবা অন্য কোনও কিছুর দোকান দেওয়া হবে। বক্সিরহাট থেকে নির্মলকে নিয়ে এসে অন্য চিন্তাভাবনা না করে স্টেশনারি কাম পান সিগারেটের দোকান করে দেওয়া হয়। কিন্তু কিছুদিন চলার পর দোকানে ছোট ছোট স্কুল বা কলেজ পড়ুয়া ছেলেদের নেশার জিনিস কিনতে দেখে সৎ ও আদর্শবাদী স্বপনবাবু দোকান বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত নেন। চিন্তাভাবনা করা হয় উন্নতমানের দার্জিলিং চা এবং হাল্কা টিফিনের দোকান করা হবে। যেহেতু দোকানের নাম টপ টি হাউস তাই গুণগত মানকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হল। সঙ্গে রইল শিলিগুড়ির অত্যন্ত জনপ্রিয় পরিমলের চপ। পরবর্তীকালে আনুষঙ্গিক টিফিনের আইটেমও বাড়ানো হল। বাড়তে লাগল গুণগ্রাহী চা অনুরাগীদের সংখ্যা। কসমস মলের পরিচালকবর্গের কাছ থেকে অনুরোধ এল ভেতরে কাউন্টার দেওয়ার জন্য। সামান্য ভাড়াতে কসমস মলে আর একটি দোকান দেওয়া হয়। চা-টোস্ট, ঘুগনি, বাটার টোস্ট, মোমোর জনপ্রিয়তার পাশাপাশি সুস্বাদু দার্জিলিং চায়ের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে।

কসমস মলেই কাকতালীয়ভাবে আলাপ দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ ম্যানেজার দার্জিলিংয়ের বিজলীমণি টি এস্টেটের সঞ্জীব কৃষ্ণ গুপ্তার সঙ্গে। ভদ্রলোকের বিশেষত্ব হল ঝরঝরে বাংলা বলতে পারেন এবং ইংরেজি, হিন্দি, নেপালি, সাদ্রীতেও তুখোড়। অসম্ভব রসিক, অগাধ জ্ঞান এবং একজন অত্যন্ত ভাল টি টেস্টার। কোনও নেশা করেন না, দার্জিলিং টি-এর সমঝদার। কসমস মলে এলেই একবারের জন্য হলেও টপ টি হাউসে পাখি, সোনালিদের কাছে এসে চা পান করেন। কোনও সময় একা, কোনও সময় পরিবারসহ। তাঁর কাছে জানলাম টি টেস্টিংয়ের খুঁটিনাটি যা আগে জানা ছিল না। সঞ্জীববাবুর কাছ থেকে জানতে পারলাম আসাম, ডুয়ার্স, তরাই, দার্জিলিং, কাছাড় ইত্যাদি অঞ্চলের চায়ের মধ্যে যেমন পার্থক্য আছে, তেমনই পার্থক্য আছে উৎপাদন পদ্ধতিতে। পার্থক্য আছে স্বাদ, গন্ধ, রং ও প্রকৃতির। তাই চায়ের দরে হেরফের হতে পারে। চা অনেকের কাছে নির্দোষ নেশা হলেও একজন টি টেস্টারের কাছে তা পেশা। টি টেস্টারের ওপর নির্ভর করে চায়ের ভাগ্য, ভবিষ্যৎ, চা বাগিচা এবং দেশের অর্থনীতি। টি টেস্টারকে সাজানো অনেক কাপের চায়ে চুমুক দিয়েই সিদ্ধান্ত নিয়ে বলতে হবে চায়ের মান কোন জাতের। একজন টি টেস্টার হলেন চরম নির্ধারক যাকে এক চুমুক চা খেয়ে, চোখে দেখে বা হাত দিয়ে ঘষে ঘষে পরীক্ষা করে বলে দিতে হয় চায়ের মান এবং বাজার দর।

আর ঠিক এই জায়গাতেই জোর দিয়েছে টপ টি হাউস মান এবং বাজার দরের প্রশ্নে। গুণগত মানে আপোষ নয়, আবার দামও সর্বসাধারণের নাগালের মধ্যে। গুণগত মান অর্থাৎ কোয়ালিটি কীভাবে ধরে রাখা হয়? প্রশ্নের উত্তরে স্বপনদা জানালেন— পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দোকান, বসার সুবন্দোবস্ত, ঝকঝকে বাসনপত্র, চা তৈরি করার আধুনিকতম

ইলেকট্রনিক উপকরণ। চমকে গেলাম 'আধুনিকতম' উপকরণ শুনে। কারণ চা বলতে আমাদের চোখের সামনে ভাসে নোংরা সসপেন, ছোট কাচের গ্লাস বা কাগজের কাপ, অনেকস্থানে এখনও বহাল তবিয়তে চলা প্লাস্টিকের কাপ, নোংরা ছাঁকনি আর সর্বোপরি ভানুর শোনা কমিকের সেই উক্তি, 'মধু একখান গজ আন দেহি'। অর্থাৎ তিন ফুটে এক গজ এর মতো শত সহস্রবার ফোটানো চায়ের ক্রেতা তো আমরাই। সেখানে 'টপ টি হাউসে' ইলেকট্রিক্যাল ওভেন, টোস্টার, মাইক্রোওভেন, তাওয়া, ওটিডি দেখলে বিস্মিত তো হতেই হয়। আশ্বস্ত করলেন শ্যামা সাহা। স্বপন সাহার অর্ধাঙ্গিনী, টপ টি হাউসের খোদ মালকিন। জানালেন, স্বপনবাবু যেহেতু নিজে দার্জিলিং চায়ের গুণগ্রাহী, তাই যে চা পাতাটা কেনা হয় এবং ব্যবহার করা হয় সেগুলো একটু দেখেই কেনা হয়। গুণগত মানের চা ক্রয় করা হয় এবং ব্লেন্ডিংও নিজের হাতেই করা হয়।

চাকরিসূত্রে স্বপন সাহা কর্মরত আলিপুরদুয়ারে। ব্যবসা সামলান তাঁর স্ত্রী শ্যামা সাহা এবং ভাগ্নে তাপস, নির্মল প্রমুখ। উত্তম, নির্মল, তাপসকে সবদিক সামলাতে হয়। কসমসের তৃতীয় তলে তপতী এবং সোনালির উপরেই প্রতিষ্ঠানের দায়ভার ন্যাস্ত। হোটেল ডলি-ইন এর বিপরীতে 'টপ টি হাউসের' স্টোর সামলায় রাজু, মমতাদি এবং বিশ্বজিৎ। স্টেশন ফিডার রোডে সজল, বিকাশ, খোকন, বিপুল এবং সিটি সেন্টারে পূর্ণ দায়িত্ব সামলায় তাপস, পপি, গোলাপিরা। আলিপুরদুয়ারের স্টলে আছে কাকা, ভাগ্নে রাজীব এবং স্বপনবাবু মাঝে মাঝে অবসরের দিনে দেখাশোনা করেন। টপ টি হাউসের আলিপুরদুয়ারে পরিচিতি ডুয়ার্স উৎসবে এবং আলিপুরদুয়ার জেলার পুজো পরিক্রমায়। এবারের কোচবিহার রাসমেলাতে টপ টি-এর স্টলে ভালো চায়ের স্বাদ নিতে এসেছিলেন স্থানীয় এমএলএ এমপি মন্ত্রীরা।

> টপ টি হাউসের কর্ণধারেরা ন্যায্য দামে উন্নত মানের চা খাওয়ানোর মধ্য দিয়ে সমাজের আপামর মানুষের হৃদয়ে পৌঁছানোর ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। আর সেই কারণেই চা-ওয়ালা এই ধারণা থেকে বেরিয়ে এসেছে একটি পরিবার এবং দোকানের কর্মচারীরা।

আলিপুরদুয়ারের কলেজ হল্টে স্ট্যাচুর পাশেই আলিপুরদুয়ারের টপ টি হাউসের শাখা।

টপ টি হাউসের কর্ণধার শ্যামা সাহা উচ্চশিক্ষিতা। উচ্চশিক্ষিতা হয়েও চাকরি না পাবার একটা দুঃখবোধ ছিলই। বরাবরই আত্মমর্যাদা সহকারে বেঁচে থাকার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বলেই এক সময়ে জীবনবিমার কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। তাই একদিকে টাইম পাস, অন্যদিকে অর্থনৈতিকভাবে স্বপনবাবুকে সহযোগিতা করার মানসিক অনুপ্রেরণায় ব্যবসার কাজ দেখাশোনা করতে লাগলেন এবং যেহেতু স্বপনবাবুর মূল পেশা সরকারি চাকরি তাই তিনি নিজে ব্যবসার সঙ্গে ধীরে ধীরে সম্পর্কযুক্ত হয়ে গেলেন। কসমস চালু হওয়ার মুখে ২০০০ সালে সেই যে শ্যামা সাহা যুক্ত হয়েছেন, আজ তিনি টপি টি হাউস নামক পরিবারের প্রধানা। শ্যামাদির কাছ থেকে জানা গেল একটি অজানা তথ্য। সৎ, নির্লোভ, পরোপকারী, স্বপন সাহা সত্য ছাড়া কারো কাছে মাথা নোয়ায় না। ভগবান ছাড়া কাউকে ভয়ও পায় না। কিছু ব্যক্তিবিশেষের ধারণা ছিল চাকরি বাদ দিয়ে স্বপনবাবু ব্যবসার কাজে অধিকতর আগ্রহী। টপ টি হাউসের জনপ্রিয়তা যখন উর্দ্ধ গগনে তখন আলিপুরদুয়ারে স্বপনবাবু ট্রান্সফার হয়ে গেলেন। তাঁর জেদ চেপে যায়। স্বপনবাবু তখন আরও একাধিক দোকান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল তিনি নিজে উপস্থিত না থেকে দোকানগুলিকে জনপ্রিয় করে তোলা। আজ তিনি সফল একজন ব্যবসায়ী। ট্রান্সফারের ছয় মাসের মধ্যে সিটি সেন্টারে ২০১৫-র মে মাসে টপ টি হাউসের কাউন্টার, ২০১৫-র অক্টোবরে বিধান মার্কেটের দোকান, ২০১৬-র জুলাই মাসে স্টেশন ফিডার রোডে এবং ২০১৬-র ১২ ডিসেম্বর আলিপুরদুয়ার কলেজ হল্ট মোড়ে স্ট্যাচুর সামনে স্টেট ব্যাঙ্কের পাশে ট্রাফিক মোড়ে।

শক্তি, আত্মবিশ্বাস, সততা, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, ব্যবহার, গুণগত মান, নির্ভরযোগ্য এবং ন্যায্য দাম টপ টি হাউসের রেসিপি। নেতাজি কেবিনে বসেই আগামী দিনের স্বপ্নজাল

বোনা শুরু করেছিলেন স্বপন সাহা এবং শ্যামা সাহা। এমনকি বিবাহবার্ষিকীর দিনেও নেতাজি কেবিনই টানত স্বপনবাবুদের। আর কাকতালীয়ভাবে আজ জীবনের মধ্যপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তাঁরা ক্ষুদ্র উদ্যোগপতি কারণ অনেকগুলি কর্মসংস্থান তাঁদের হাত দিয়েই। আত্মবিশ্বাস এবং কাজ করার মনোভাব নিয়ে টপ টি হাউস পরিবার অনেকদূর এগবে বলেই বিশ্বাস শ্যামা সাহার।

একটাই ছেলে, মিডিয়া সায়েন্স নিয়ে তৃতীয় বর্ষে পাঠরত। ছেলে শুভঙ্করও চলতি ব্যবসাকে নতুন রূপ দিয়ে শিলিগুড়ির বাইরে ছড়িয়ে দিতে চায়, ফ্র্যাঞ্চাইজি দেওয়ার ইচ্ছা রয়েছেও তার। শুভঙ্করের মিডিয়া সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা শেষ হলে মাস্টার্স ডিগ্রির ফাঁকে ফাঁকে সে ব্যবসা নিয়ে নতুনভাবে চিন্তাভাবনা করবে বলে জানা গেল। কলকাতার দিকে জায়গা খোঁজা হচ্ছে। সল্টলেক সেক্টর ফাইভ-এ মোটামুটি পছন্দসই একটা ঘর দেখা হচ্ছে যেখান থেকে ব্র্যান্ড ভ্যালুর উপর গুরুত্ব দিয়ে ক্রেতাদের রুচি এবং পছন্দমতো দ্রব্যসামগ্রী, হাল্কা টিফিন এবং সুস্বাদু চা ক্রেতাদের হাতে তুলে দেওয়ার মাধ্যমে দার্জিলিং চায়ের আমেজকে আভ্যন্তরীণ বাজারে ছড়িয়ে দেওয়াই মূল লক্ষ্য 'দি টপ টি হাউস'-এর। আর সেই কারণেই অত্যন্ত বাছাই করা দার্জিলিং চায়ের স্যাম্পল ক্রয় করে সুনিপুনভাবে প্রথমে ব্লেন্ডিং করা হয়। এরপর কোয়ালিটি 'সিলেক্ট' এবং 'টেস্ট' করে সব কাউন্টারে একই গুণগত মান সম্পন্ন চা পাঠানো হয়। বেকারির জিনিসপত্র সবই আগাম অর্ডার দিয়ে আনানো থাকে। টপ টি হাউসের নিজস্ব আইটেম বিশেষ গুণগত মান সম্পন্ন ঘুগনি, যার মশলার মধ্যে আছে নিজস্ব ঘরানার আস্বাদ এবং বিশুদ্ধতা। মোমোর চাটনির এক আলাদা ঘরানা আছে যা অতীব সুস্বাদু এবং ক্রেতাদের বিশেষ করে নব্য ভোজনরসিকদের অত্যন্ত পছন্দের। আর তাই এক দুইবার এলে বারবার আসেন ক্রেতারা এবং নিয়মিত খরিদ্দারের সংখ্যা বেশি।

নিয়মিত ক্রেতাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাই টপ টি হাউসের কর্ণধারেরা ন্যায্য দামে উন্নত মানের চা খাওয়ানোর মধ্য দিয়ে সমাজের আপামর মানুষের হৃদয়ে পৌঁছানোর ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। আর সেই কারণেই চা-ওয়ালা এই ধারণা থেকে বেরিয়ে এসেছে একটি পরিবার এবং চা দোকানের কর্মচারী নয়, 'টপ টি হাউস পরিবারের সন্তান' এই অভিধায় ভূষিত হয়ে নিজ আত্মসম্মান বজায় রেখে কর্মচারীরা প্রত্যেকেই কাজ করছে মাথা উঁচু করে সম্মানের সঙ্গে। যে আত্মসম্মান বজায় রাখতে একদিন লড়াই শুরু করেছিলেন স্বপনবাবু, সেই আত্মসম্মানবোধেই বলীয়ান বিকাশ, উত্তম, নির্মল, তাপস, কাকারা— যারা প্রত্যেকেই টপ টি হাউসের ভিত্তি।

গৌতম চক্রবর্তী

চা পানের মাহেন্দ্রক্ষণ মেলে 'টি মোমেন্টস'-এ

বেশ কিছু বছর আগে প্রকাশিত একটি বড় চা কোম্পানির হাউস জার্নালের প্রচ্ছদের একটি স্লোগান আমার বেশ লেগেছিল — চা হল নতুন শতাব্দীর পানীয় — 'ড্রিংক অব দ্য নিউ মিলেনিয়াম'। গত ডিসেম্বরের এক হিমেল সন্ধ্যায় মাল শহরের উপকণ্ঠে এক চা-বুটিকের মুক্তাঙ্গনে খোদ মালকিনের সঙ্গে আড্ডায় বসে

গরম চায়ে কণ্ঠ ভেজাতে গিয়ে মনে পড়ে গিয়েছিল সেই দুর্দান্ত স্লোগান। আর সেই সঙ্গে আরেকটি অনুভূতি জন্মেছিল — সত্যিই এক কাপ ভালো চা উপহার দেয় কিছু অনির্বচনীয় সুখের মূহুর্ত। মালবাজারের সেই চায়ের আড্ডা আরও মনে করিয়ে দেয়, আমাদের এই ডুয়ার্সের চা-ই বিশ্বের যে কাউকে দিতে পারে সেই উপহার। ভাবা যায় না!

চালসা মোড় থেকে মালবাজার পৌঁছনোর আগে মাল নদী পেরিয়ে বাঁকটা ঘুরলেই রায়

অ্যান্ড কাজিন পেট্রোল পাম্প। সেই ক্যাম্পাসেই একপাশে ছোট্ট ফুলের বাগান দিয়ে ঘেরা মনোরম পরিবেশে আয়োজন চায়ের আড্ডার। ইতিউতি ছড়ানো সুদৃশ বেতের, বাঁশের, কাঠের ও রট আয়রনের তৈরি সোফা ও চেয়ার, কোনও কোনওটায় গদি আঁটা। চা-গাছের শেকড় দিয়ে তৈরি সেন্টার টেবিল। এককোনে রাখা একটি গীটার, চাইলে কোলে তুলে নিয়ে যে কেউ জমিয়ে দিতে পারে হাসি-আড্ডা-গানে, কোথাও কোনও বিধিনিষেধ নেই। কাউন্টার থেকে এগিয়ে আসবে হাসিমুখ তরুণ, হাতে মেনু কার্ড, কী নেবেন বলুন! দার্জিলিং ফার্স্ট ফ্লাশ? নাকি রোস্টেড? নাকি জৈব সারে তৈরি গ্রীণ টি? সঙ্গে ভালো মাফিন? প্রাণটা বেলুনের মতই উৎফুল্ল হয়ে উঠবে চা তৈরি হয়ে টেবিলে আসতেই, সঙ্গে একটি ছোট্ট বালির ঘড়ি, হিসেব করে পাঁচ মিনিট ভিজবে চায়ের পাতা! পাঁচ মিনিট! আপনি অধীর অপেক্ষায় সেই মাহেন্দ্রক্ষণের জন্য, যে প্রথম চুমুক জিহ্বা-নাসিকা দিয়ে পৌঁছে যাবে মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের তন্ত্রীতে, তার জন্য। সৌজন্যে 'টি মোমেন্টস' মালবাজার। এই সময়ে সন্দেহাতীতভাবে সবার সেরা!

ডুয়ার্সের শতাব্দীপ্রাচীন চা বাগান মিশন

> ‘ডুয়ার্সের শতাব্দীপ্রাচীন চা বাগান মিশন হিল, আগাগোড়াই মজবুত স্বাস্থ্যের অধিকারি ও উৎকৃষ্ট চা প্রস্তুতকারক। একটা সময় পর্যন্ত পুরো চা নিলাম হয়ে যেত। বাইরে মন্দার বাজার আসতেই ভাবনার বদল, ২০১৫ সাল থেকে খানিকটা প্যাকেট করে ব্র্যান্ড নামে বিক্রি করা শুরু হল। সেই সঙ্গেই সেই প্যাকেট চায়ের গুণাগুণ বা স্বাদ সাধারণ ক্রেতাকে বোঝানোর উদ্দেশ্য নিয়েই চালু হল এই 'টি মোমেন্টস'।’

ছিল, আগাগোড়াই মজবুত স্বাস্থ্যের অধিকারি ও উৎকৃষ্ট চা প্রস্তুতকারক। একটা সময় পর্যন্ত পুরো চা নিলাম হয়ে যেত। বাইরে মন্দার বাজার আসতেই ভাবনার বদল, ২০১৫ সাল থেকে খানিকটা প্যাকেট করে ব্র্যান্ড নামে বিক্রি করা শুরু হল। সেই সঙ্গেই সেই প্যাকেট চায়ের গুণাগুণ বা স্বাদ সাধারণ ক্রেতাকে বোঝানোর উদ্দেশ্য নিয়েই চালু হল এই 'টি মোমেন্টস'। গত আড়াই বছরে জনপ্রিয়তা যথেষ্ট বেড়েছে।

ঘটনাচক্রেই দেখা হয়ে গিয়েছিল মালকিন অপলাভদ্র রায়ের সঙ্গে। মিশন হিলস এর কর্ণধার নীলমনি রায়ের পুত্রবধূ। পুত্র অর্থাৎ অপলার স্বামী শুভদীপ এখন বাগান দেখাশোনা করেন।

অপলার কাছেই মিলল এসব নানা তথ্য। তিনিই জানালেন, কেবল মালবাজারেই সীমাবদ্ধ নেই, ডুয়ার্সের চায়ের সৌরভ ছড়িয়ে পড়ছে শান্তিনিকেতন পৌষমেলায়, কলকাতা বইমেলায়, ডোভার লেন মিউজিক কনফারেন্সে, নানা ছোটবড় চা কার্নিভ্যালে। 'টি মোমেন্টস' এর উদ্যোগে। মনটা এক অদ্ভুত প্রসন্নতায় ভরে ওঠে, ডুয়ার্সের চা শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে তার গুণপনার কথা এভাবেই ছড়িয়ে দিতে হবে চারদিকে, এছাড়া আর কোনও বিকল্প পথ নেই যে!

মীনাক্ষি ঘোষ

'আড্ডাঘর' পেরোল দুটো বছর

একটা সময় ডুয়ার্স চায়ের প্রাণকেন্দ্র ছিল জলপাইগুড়ি শহর। কালের নিয়মেই হোক কিম্বা করাল দৃষ্টিতে প্রাণবন্ত সে সময় এখন যদিও ইতিহাস বলা চলে, তবু এ শহরে এখনও গুটিকয় চা-বণিক আছেন যাঁরা পরিস্থিতির কাছে এখনও নিজেদের বিক্রি করে দেন নি, তাঁরাই বাঁচিয়ে রেখেছেন ঐতিহ্যকে। সেই চায়ের শহরে একটি রইসি চা-আড্ডা থাকবে না, চায়ের কাপে ডুয়ার্স চর্চা হবে না, তা কখনও হতে পারে? এমন ভাবনা থেকেই শুরু হয়েছিল 'আড্ডাঘর', শহরের প্রাণকেন্দ্রে, মুক্তাভবনের দোতলায়, ২০১৬র ২৯ ফেব্রুয়ারি। নেটিভ সাসটেনেবল ইকোটুরিজম সোসাইটির উদ্যোগ, ব্যবস্থাপনা ও প্রচারে 'এখন ডুয়ার্স' পত্রিকা। স্লোগান ছিল — ডুয়ার্সের চা নিয়মিত পান করুন, ডুয়ার্সের বইপত্র কিনুন পড়ুন, ডুয়ার্সের প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণ রক্ষা করুন, ডুয়ার্সের গৌরব ও সৌরভ ছড়িয়ে দিন।

মনীষিকা নন্দী। মাতিয়ে দিলেন 'আড্ডাঘরে বসন্ত সন্ধ্যা'। ১লা মার্চ 'আড্ডাঘর' তিন বছরে পা দিল।

এমন একটি আড্ডাঘর পেয়ে বলাই বাহুল্য বেশ উদ্দীপিত হয়েছিল ডুয়ার্সের সুশীল সমাজ। একে একে চালু হয়ে গেল শ্রীমতি ডুয়ার্স ক্লাব, সাহিত্য ক্লাব। এক বছরের মধ্যেই সূচনা হল 'আড্ডাঘর ক্লাব'-এর। কিন্তু তরুণ সম্প্রদায়কে না পেলে সেই উদ্দীপনাকে ধরে রাখা যায় না, আড্ডাঘরে এল টেবল টেনিস, ক্যারম ও দাবার বোর্ড। এখন সন্ধে নামার আগেই সেসবের দখল নেয় ইয়ং ব্রিগেড, চায়ের স্বাদ নিতে হাজির হন সব বয়সের মানুষ। 'আড্ডাঘর ক্লাব'-এর প্রেসিডেন্ট প্রশান্তনাথ চৌধুরী জানালেন, জন্মদিনকবিতা পাঠ বই প্রকাশ নাটকের মহড়া শর্টফিল্ম শো সেলস মিটিং গানের বৈঠক সবই হচ্ছে আড্ডাঘরে, যে কেউ নামমাত্র মূল্যে ভাড়া নিয়ে নিজেদের অনুষ্ঠান করতে পারেন এখানে। সদস্যদের অবশ্যই অগ্রাধিকার মেলে। কিন্তু সবকিছুর মূলেই থাকে ডুয়ার্সের চা পান। তাঁর মতে, ধীরে ধীরে একটি রাজনীতির প্রভাবমুক্ত কমিউনিটি গড়ে উঠছে এখানে, অদূর ভবিষ্যতে পিছিয়ে পড়া ডুয়ার্স নিয়ে গঠনমূলক ভাবনায় সমমনস্ক মানুষের অভাব হবে না। তবে হ্যাঁ, তিনি এও মানলেন, এ ধরণের অলাভজনক উদ্যোগ টিকিয়ে রাখাটা আজকের নিজস্বী-যুগে বেশ কঠিন। লিপ ইয়ারে জন্ম নেওয়া 'আড্ডাঘর' চার বছরের প্রথম ল্যাপ অতিক্রম করতে পারে কি না সেটাই দেখার।

উত্তরায়ণ সমাজদার

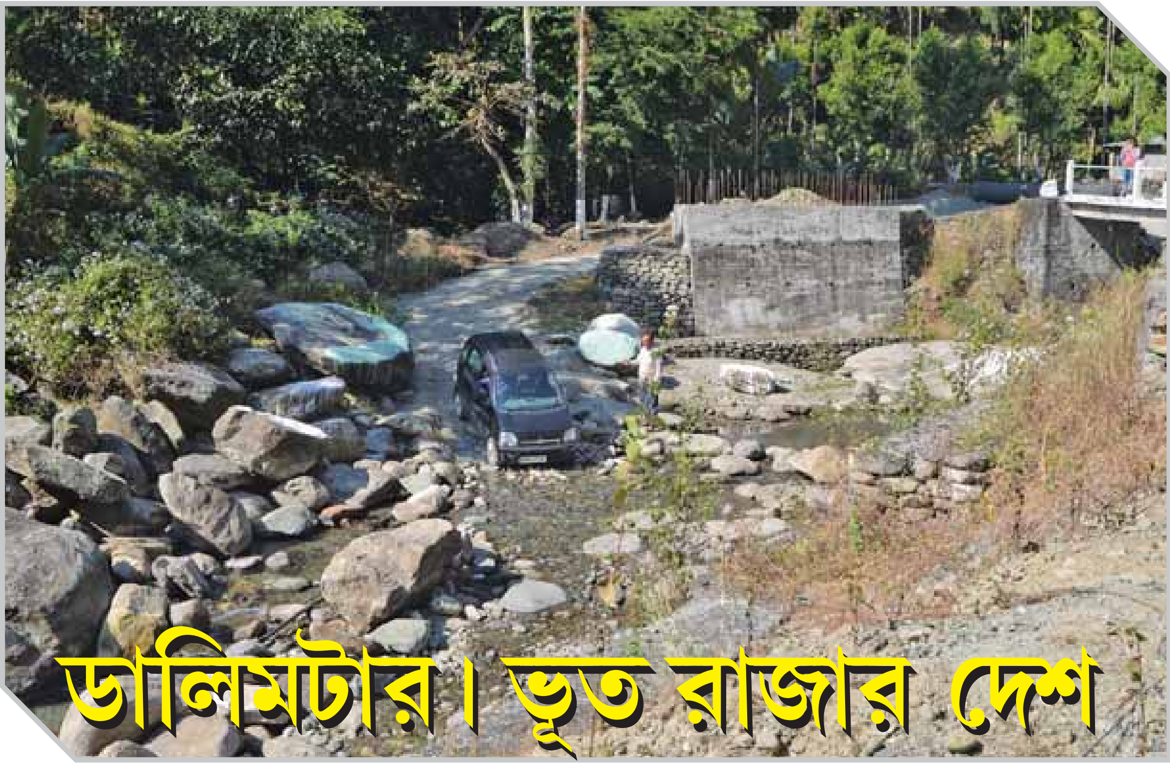

ডালিমটার। ভূত রাজার দেশ

আসুন না, একবার ডালিমটারে ঘুরে যান। ডালিমগড়ের ইতিহাস জানলে আর পাঁচপুকুরির অদ্ভুত গল্প শুনলে আর না এসে পারবেন না, এ হক কথা আমি তিন সত্যি দিয়ে বলে দিতে পারি।

হংস গ্যাবো আচক ছিলেন সিকিমের রাজা। ভুটানের রাজকুমারীর সঙ্গে বিয়ে হয় তাঁর। বিয়ের সময় যৌতুক হিসেবে বেশ কিছু ভূভাগ পেয়েছিলেন সিকিমরাজ। কিন্তু বারো বছর কেটে যাবার পরও তাদের কোন সন্তান না হওয়ায় রাজকুমারী শেষমেশ ভুটানে তাঁর মাইকে চলে যান। সিকিমরাজ 'রাই' পদবিযুক্ত আর এক কন্যাকে বিবাহ করেন এবং তাঁর গর্ভে এক সন্তান আসে। পারিবারিক নানান কারণে সেই সন্তানকে মেরে ফেলার চেষ্টা হলে তার নানী মেয়ের ভ্রূণকে রক্ষা করেন।

এখন যেখানে ঝান্ডি, তার কাছেই ছিল চ্যাখুনডারা নামে একটি জায়গা, সেখানেই একটি গোয়ালে লুকিয়ে রেখে পুনো গ্যাবো আচককে বড় করতে থাকেন তাঁর দিদা। গ্যাবো আচককে নানান বিদ্যায় পারদর্শী করে তুলতে থাকেন তিনি। তিনি নিজে তান্ত্রিকবিদ্যা জানতেন বলে সেটিও শেখালেন গ্যাবোকে। একটু বড় হতেই সৈনিকবিদ্যায় দক্ষ করে তুললেন আর নিজে হাতে বেতের পোষাক তৈরি করে পরিয়ে দিলেন নাতিকে যাতে তরোয়ালের আঘাতে ক্ষতি না হয়।

বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্যাবো নিজের বেশ কিছু সঙ্গীসাথীদের নিয়ে এক সেনানী দল তৈরি করে ফেললেন। এবার নিয়মিত সেই দলের প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করার জন্য একটি সঠিক স্থানের প্রয়োজন হয়ে পড়ল। তৈরি হল ডালিম গড় বা ডালিম ফোর্ট। কিন্তু তখন কোন বৈজ্ঞানিক বাস্তুবিদের সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনাই ছিলনা, ফলে বড় একটা ত্রুটি রয়ে গেল দুর্গে। নিচের দিকের পাথরগুলো ছোট ছোট আর ওপরের দিকের পাথরগুলো বড় বড়। ফলে ভারসাম্যের অভাব হল। কাঠামোগত দিক থেকে ত্রুটি থাকলেও দুর্গে প্রবেশ করা কিন্তু দুরূহ ছিল। দুর্গের ভেতরেই চলতে লাগল প্রশিক্ষণ আর সেই সাথে প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল গ্যাবো আচক-এর আধিপত্য।

তারপর যা হওয়ার কথা তাই হল। ব্রিটিশের চক্ষুশূল হলেন। ব্রিটিশ সেনা গরুবাথান আর নিমবস্তি থেকে কামান দেগে কয়েকবার চেষ্টা করেছিল ফোর্ট ধ্বংস করে দেবার। কিন্তু কথিত আছে, গ্যাবো যেহেতু তান্ত্রিকবিদ্যা জানতেন তাই প্রত্যেকবারই নাকি আগাম টের পেয়ে যেতেন যে আক্রমণ হবে। তাই আগে থেকেই তা প্রতিরোধ করার যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত করে নিতে পারতেন। ব্রিটিশেরা এই ধাক্কা সহ্য করতে পারলনা। ঘি তোলার জন্য আঙুল বাঁকা করল তারা।

এক কমান্ডার, রাখাল সেজে ঘোরাফেরা করতে লাগল ডালিমটারেরে আশেপাশে। কোনও কোনও সৈনিকের সঙ্গে ভাব জমিয়ে,

সোনার মুকুট, সোনার মোহর এসব দিয়ে প্রলোভন দেখিয়ে তাদের হাত করে নেয় সেই চর। এরপর ১৭২৬ এর জানুয়ারি মাসের একটি দিনে এই বিশ্বাসঘাতক সৈনিকদের সাহায্যেই বোমা ঢুকিয়ে দেয় ব্রিটিশ। ভারসাম্যের অভাব থাকায় মাথার দিকের খানিকটা অংশ ভেঙে পড়ে ঠিকই কিন্তু তবুও বাকিটা বেঁচে যায়। পুনো গ্যাবো আচক নিজেকে লুকিয়ে ফেলে বেঁচে যায়।

পরাজয়ের গ্লানি দগ্ধে দগ্ধে পীড়ন করতে থাকে ইংরেজদের। তাই থেমে না থেকে ভুটানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আবার ফন্দী আঁটল তারা। ভুটানের তৎকালীন রাজা বন্ধুত্বের বন্ধন বজায় রাখার উদ্দেশ্য নিয়ে এক ভোজসভার আয়োজন করে। তাতে গ্যাবো আচকেরও নিমন্ত্রণ ছিল। ধামসাং-এর রাজা পুনো গ্যাবোর পানীয়তে বিষ মিশিয়ে দেয়। অজ্ঞান হয়ে পড়ে গ্যাবো। সম্ভবত সেটাই তাঁর মৃত্যু, কিন্তু লোকমুখে কথিত কাহিনি এখানেই শেষ হয়ে যায়নি। জ্ঞান ফিরলে ছয়জন লোক নাকি কাটতে আসে তাঁকে। কিন্তু তন্ত্র সাধনায় সিদ্ধ গ্যাবোকে বামফোকের সাহায্যেও নাকি মারতে পারেনি তারা। (ভুটানিদের এক ধরনের তরোয়ালের মত অস্ত্রের নাম বামফোক)। অবশেষে নবমতম এক তোতলা সৈনিক, যে কারণে তার নাম বকবকে ভোটে, গ্যাবোর শিরোচ্ছেদে সক্ষম হয়। মাথা ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পড়ে চেল নদীর এক গভীর কুয়োর মধ্যে। কিন্তু বাকি শরীর? সেটা তো রয়ে গেল! এর পাঁচদিন পর নাকি সেই মাথা এবং শরীর জোড়া লেগে এক হয়ে যাওয়ার দিন। অর্থাৎ গ্যাবোর পুনোরুজ্জীবনের দিন। লোককাহিনি তাই বলে। ব্রিটিশেরা তাই শরীরকে টুকরো টুকরো করে এমনভাবে কেটে ফেলে যাতে আর শরীরের সঙ্গে মাথা জোড়া লেগে বেঁচে উঠতে না পারে রাজা। বলা হয় মাথাটা নাকি ওই শরীরকে না পেয়ে চিল হয়ে আকাশে উড়ে যায়।

'পুনো' মানে মহারাজা আর গ্যাবো আচক হল তাঁর নাম। এমন এমন অলৌকিক সব কাহিনি তাঁর সম্পর্কে শোনা যায় যে তাঁকে তাঁর এলাকায় 'ভূত রাজা' বলেও ডাকা হত এমনকি এখনও হয়। 'ভূত রাজা'র নানান গল্প শুনতে হলে, জানতে হলে আসতে হবে 'ডালিম' এ। গরুবাথান থেকে ডালিম ৭ কিলোমিটার পথ। পাহাড়ের ওপর উঠতে হবে গাড়ি নিয়ে। অসংখ্য হেয়ারপিন বাঁক। এক একটা বাঁকে বেশ কয়েক ফুট উচ্চতায় উঠে যাচ্ছে গাড়ি। ডালিমে পৌঁছে বড়সড় একটা ঝোরা পেরোতে হল গাড়িতেই। একটা কংক্রিটের ব্রিজ আছে বটে কিন্তু সেটা

হোমস্টের এলাকার মধ্যেই রয়েছে একটি ভিউ পয়েন্ট। সেখান থেকে অনেক নীচে বয়ে চলা ঝোরা দেখা যায়, যাকে ঘিরে রেখেছে অনেকগুলো পাহাড়ের সারি। পাহাড়ের গা বেয়ে স্পাইরাল সিঁড়ির মত বাঁক নিয়ে নিয়ে উঠে গেছে পিচের রাস্তাগুলো। এক একটি রাস্তার গন্তব্য এক এক দিকে। কত রকমের গাড়ি উঠছে সেই রাস্তাগুলো ধরে।

গাড়ির চেহারার চাইতে ছোট। ফলে নদীর পাথরের জলের ওপর দিয়ে দুলে দুলে গাড়ি ওপারে পৌঁছল। এখান থেকে কিলোমিটার উঠলাম আমরা। ডালিমটার। 'টার' মানে পাহাড়ের ওপর সমভূমি। ঠিকই তাই। সেখানে আমাদের হোমস্টেতে ঘর রাখাই ছিল। এখান থেকে ডালিমগড় যেতে হলে গাড়িতে কুড়ি মিনিটের পথ। দুটো মাত্র ঘরে আমরা দুটো পরিবার। মনে হচ্ছে যেন এটাই আমাদের বাড়ি। কি অপূর্ব নির্জনতা, কিন্তু নিঃসঙ্গতা নেই। আতিথেয়তায় মনে হয় কোন আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে এসেছি যেন। হোমস্টের এলাকার মধ্যেই রয়েছে একটি ভিউ পয়েন্ট। সেখান থেকে অনেক নীচে বয়ে চলা ঝোরা দেখা যায়, যাকে ঘিরে রেখেছে অনেকগুলো পাহাড়ের সারি। পাহাড়ের গা বেয়ে স্পাইরাল সিঁড়ির মত বাঁক নিয়ে নিয়ে উঠে গেছে পিচের রাস্তাগুলো। এক একটি রাস্তার গন্তব্য এক এক দিকে। কত রকমের গাড়ি উঠছে সেই রাস্তাগুলো ধরে। এত শান্ত আর আপাত স্তব্ধ পরিবেশেও মানুষের কত ব্যস্ততা! মনে মনে উধাও হয়ে গিয়েছিলাম সেইদিকে তাকিয়ে পাহাড় যেখানে আকাশে মিশেছে। ওরা নিজেরা কী কথা বলে, কীভাবে আবেগ বিনিময় করে সে আমাদের বোঝবার কথাই নয়। তবু চোখ চলে যায়। আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে পাহাড় নাকি ঘুমায়। কোন এক গীতিকার গান লিখেছিলেন এভাবে। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনুভব করছিলাম, উপলব্ধি করছিলাম, উপভোগ করছিলাম আর আড় পেতে লুকিয়ে দেখার চেষ্টা করছিলাম ওদের প্রেম। নিজেকে কোথাও একটা খুব একলা লাগছিল।

গরুবাথান থেকে যেখানে 'ডালিম' এ পৌঁছলাম, সেখানে সেই 'মজার দেশে'র মতো কান্ড। মানুষ চলে পায়ে হেঁটে ব্রিজ দিয়ে আর গাড়ি যায় নদীর ওপর দিয়ে টলতে টলতে। আমরা সবমিলে সাতজন। আমি, আমার ড্রাইভার কাম পোলাপানদের বাবা, আমার ভাই, ভাইয়ের বৌ আর সর্বসাকুল্যে তিনটে বাচ্চা। মনুষ্যকুল ছাড়া প্রধান এবং সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে ছিল সে হল আমাদের ওয়াগনার, বারো বছরের অনেক কঠিন চলার পথের সঙ্গী। ফোর হুইল ড্রাইভ হলে কোনই চিন্তা ছিল না। কিন্তু সকলের একটু চিন্তা হল বৈকি। তবে আমাদের চাইতে তাঁর চিন্তা অনেক বেশি। অভিজ্ঞতা বলে, আমার ড্রাইভার লোকটি ভালই গাড়ি চালায়। নাহোক অনেক কঠিন কঠিন রাস্তায় আমাকে ছেলেমেয়েসহ নিয়ে গেছে বেড়াতে। তাই আমার টেনশনটা খানিকটা কমই ছিল। বোঁ বোঁ হুংকার ছাড়তে ছাড়তে গাড়ি ওপারে

পরবর্তী অংশ ৩৫ পাতায়

ম্যান্ডারিন থেকে চিয়োরি
কিংবা কালিম্পং থেকে কোচবিহার
ইকো টুরিজমের পথটি এখনও গোলমেলে !

নাতাশা এবং মিষ্টি ম্যান্ডারিন

আবহাওয়া এবং কীটনাশকের ব্যাবহারে জাত-মান খুইয়েছে পাহাড়ের মিষ্টি ম্যান্ডারিন। এ ঘটনা যে প্রথম ঘটল তা নয়। এর আগে চায়ের ক্ষেত্রে বিপত্তি হয়েছিল। সে সময় ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন দীর্ঘ সময়ের জন্য দার্জিলিং চায়ের রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। আসলে বেশি কীটনাশক ব্যবহার করার কারণে স্বাভাবিকভাবেই ম্যান্ডারিনের গন্ধ এবং রং দুটোই বিবর্ণ হতে শুরু করেছে। আবার হিমালয়ের দ্রুত বদলে যাওয়া আবহাওয়ার সঙ্গে ম্যান্ডারিন খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না, কারণ রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহারের কারণে, গাছের বন্ধু পোকামাকড়রা নেই আর পাশাপাশি মাটি গেছে বিষিয়ে। সোজা কথায় ম্যান্ডারিনের প্রায় মরোমরো অবস্থা। চিকিৎসা ছাড়া গতি নেই।

গবেষণাগারে ম্যান্ডারিনের সেই জীবন দানের কাজটিই করছেন কৃষিবিজ্ঞানী ড. নাতাশা গুরুং। দিল্লি,কর্ণাটক এবং বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশুনা শেষে সিকিমের মেয়ে নাতাশা এখন কালিম্পং-এ ম্যান্ডারিন বাঁচানোর যুদ্ধে। নাতাশার লড়াইয়ে আমাদের একশোভাগ সমর্থন রইল। কিন্তু গবেষণাগারের প্রযুক্তিনির্ভর এবং 'সবুজ বিপ্লব' প্রভাবিত জ্ঞান কি জেতাতে পারবে নাতাশাকে? সফল হলে খুব ভাল কিন্তু কালিম্পং-এর প্রকৃতি সরাসরি হিমালয় প্রভাবিত। সেখানে টেঁকসই বা সাসটেইনেবল উন্নয়ন ও উৎপাদনে, প্রযুক্তি ও 'সবুজ বিপ্লবের রাসায়নিক নির্ভর সাফল্য' থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, একটি নির্দিষ্ট ভূগোল থেকে উঠে আসা মানুষের অভিজ্ঞতা এবং সংস্কৃতি। আর এই কালচার বা সংস্কৃতি ওতপ্রোতভাবে যুক্ত এগ্রি-'কালচার'-এর সঙ্গে।

সরকারি, বেসরকারি, অসরকারি বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠন যারা কোচবিহার থেকে কালিম্পং— এই এলাকা নিয়ে ভাবেন এবং কাজ করেন তাদের কাছে কয়েকটা বিষয় ভেবে দেখার জন্য অনুরোধ করব। একসময় লাভা ও আলগারা

'চিয়োরি' নতুন করে তৈরির করার পর, ছবি- আলেক্স কের-এর সৌজন্যে

'চিয়োরি'-র অভ্যন্তরে আলেক্স কের স্বাক্ষাৎকার নিচ্ছেন কিয়োনো য়ুমি, ছবি- নিপ্পন ডট কম-এর সৌজন্যে

এলাকায় বাচ্চা ছেলেরা খেলাচ্ছলে প্রতিদিন গুলতি দিয়ে পাখি মারতো। এটা ছিল দীর্ঘদিনের প্রাত্যহিক বিনোদন। ২০০৭ সালে একটি অসরকারি সংগঠনের ডাকে বাচ্চারা ৭০০ গুলতি ফিরিয়ে দিয়েছিল। সেই পাখি মারার রেওয়াজ কি বন্ধ হয়েছে? ম্যান্ডারিনের বাগানে এখনও কি পাখিরা আসে? একটি এলাকায় পরিবেশের সামঞ্জস্য তৈরি করতে পাখির ভুমিকা কিন্তু অপরিসীম। এবং ঠিক এই কথাটাই বলেছিলেন, ২০১০ সালে মণিপুরের (আই.সি.এ.আর) বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী এ. রাজলক্ষ্মী। ভারতবর্ষের ১১টি প্রদেশে ম্যান্ডারিনের চাষ হয় এবং প্রচুর মানুষ সেই চাষের ওপর নির্ভরশীল। এই এগারোটি প্রদেশেই ম্যান্ডারিন ২০১০ সাল থেকে প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা করছে। কারণ প্রধানত তিনটি। পুরনো গাছ, নির্বিচারে পাখি মেরে ফেলা, অত্যধিক কীটনাশক ব্যবহারের কারণে পাখির প্রজনন ক্ষমতা কমে যাওয়া এবং সময়োপযোগী কৃষি প্রযুক্তির অভাব। পাখি শুধু একটি এলাকার প্রয়োজনীয় বাস্তুতন্ত্র তৈরি করে না, তারা গাছের বন্ধু পোকাদের ছেড়ে শত্রু পোকাদের খেয়ে নেয়।

আজ পর্যন্ত সরকারি কৃষি বিজ্ঞানীদের ধামাধরা 'ময়নার বুলি' ছাড়া, কোচবিহার থেকে কালিম্পং এই এলাকায়, ম্যান্ডারিন ও ম্যান্ডারিন চাষের সঙ্গে যুক্ত মানুষের স্বার্থে, দ্রুত বদলে যাওয়া জলবায়ুতে মাটিকে বাঁচানোর স্বার্থে, একটি ভূগোল-সংস্কৃতি- অর্থনীতিকে বাঁচানোর স্বার্থে— কখনও কেউ দেখেছেন কোনও সংস্থা, দেশেবিদেশে সমাদৃত ইকলজিস্ট ড. দেবল দেব, ড. বন্দনা শিবা, ড. হেমা সোমানাথন, ড. আশিস ঘোষদের মতো অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কোনও ন্যাশনাল সেমিনারের আয়োজন করেছে? আমি অন্তত জানি না।

অদ্ভুত হলেও সত্যি, ম্যান্ডারিনের দুর্দশা নিয়ে ১৯৭৮, ২০০২, ২০০৬ এবং ২০১০-এ বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় খুব ভাল কাজ করেছে

> একটি বিশেষ ভাইরাস গত ৭০ বছরে পৃথিবী জুড়ে ম্যান্ডারিন চাষে মড়ক তৈরি করছে, এটা সবাই জানে। সিট্রাস ট্রিস্টেজা ভাইরাস। সংক্ষেপে সিটিভি। ভয়ঙ্কর এক ভাইরাস। দাপিয়ে বেড়াচ্ছে গোটা পৃথিবী। ২০১৭ পর্যন্ত হত্যা করেছে ৫৫ মিলিয়ন ম্যান্ডারিন গাছ।

কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি, দার্জিলিং এবং কালিম্পং-এ। সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল, নাগপুরের ম্যান্ডারিন। এখন সমস্যা মুক্ত, কেন্দ্রিয় সিট্রাস গবেষণা কেন্দ্রের দাওয়াই-এ। ২০১৪-তে রেকর্ড ফলন দেওয়ার পর-ও ম্যান্ডারিন নিয়ে এখন মাথায় হাত ভুটানের। একই সমস্যার মুখে পরেছিল ইজরায়েল এবং জাপান। সময়োপযোগী ব্যাবস্থা নেওয়ায় বেঁচে গেছে তাঁদের ম্যান্ডারিন অর্থনীতি। একটি বিশেষ ভাইরাস গত ৭০ বছরে পৃথিবী জুড়ে ম্যান্ডারিন চাষে মড়ক তৈরি করছে, এটা সবাই জানে। সিট্রাস ট্রিস্টেজা ভাইরাস। সংক্ষেপে সিটিভি। ভয়ঙ্কর এক ভাইরাস। দাপিয়ে বেড়াচ্ছে গোটা পৃথিবী। ২০১৭ পর্যন্ত হত্যা করেছে ৫৫ মিলিয়ন ম্যান্ডারিন গাছ। ধ্বংসলীলা শুরু হয়েছিল ১৯৩০-এ ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনায়। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ব্রাজিল আজ ম্যান্ডারিন উৎপাদনে চিন, স্পেন, তুরস্কের পরে চতুর্থ স্থানে।

এই মুহূর্তে ড. নাতাশা গুরুং যে কাজটি করছেন সেটি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু 'এখন ডুয়ার্স' উদ্বিগ্ন একটি বিষয়ে। সিটিভি ভাইরাস থেকে চা উৎপাদন কতখানি নিরাপদ। খতিয়ে দেখা হোক এই মুহূর্তে। কেননা ১৯৭৮-এর একটি রিপোর্ট অনুযায়ী সিটিভি ভাইরাসের লক্ষ্য ম্যান্ডারিন, চা এবং পেয়ারা।

বিবর্ণ ম্যান্ডারিন, অসহায় মরু ভাল্লুক আর নেওড়া ভ্যালির বাঘ

মরু অঞ্চলে প্রাকৃতিক সম্পদ সংগ্রহের অভিযানকে জোরদার করতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ঘোষণা করে দিলেন, পরিবেশ পরিবর্তন আসলে কল্পনা। কয়েকদিনের মধ্যেই বৈজ্ঞানিক প্রমাণে বোঝা গেল, দ্রুত বরফ গলে যাওয়ায় খাবার পাচ্ছে না মরু ভাল্লুকরা। এখন নিষ্ঠুর মৃত্যুর অপেক্ষা ছাড়া উপায় নেই। পৃথিবীর যে কোনও

পুরনো 'চিয়োরি', ছবি- আলেক্স কের-এর সৌজন্যে

চিয়োরি-র ভেতরের সজ্জা, ছবি- আলেক্স কের-এর সৌজন্যে

অঞ্চলেই পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হলে সবার আগে পরিবেশ ছোবল মারে পশু-পাখি-পোকামাকড়-গাছপালা আর ফলপাকুড়ের ওপর। এগুলো সব প্রাকৃতিক সতর্কবার্তা। সাবধান না হলে প্রাকৃতিক রোষে শ্মশান হয়ে যাবে, একটার পর একটা অঞ্চল। বিবর্ণ ম্যান্ডারিন এবং নেওড়া ভ্যালির কোর এরিয়া ছেড়ে বারবার বেরিয়ে আসা বাঘ-ও এমনই এক প্রাকৃতিক ইঙ্গিত। গত পঞ্চাশ বছরে ডুয়ার্স-তরাই অঞ্চলে পরিবেশের বিপুল পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু ঠিক কী কী পরিবর্তন হয়েছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ রিপোর্ট আমাদের কাছে নেই।

বিষিয়ে গেছে— ফুরিয়ে গেছে নদী

২০১৮-র পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের রিপোর্টে যে ১৭-টি বিষিয়ে যাওয়া নদীর কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে শিলিগুড়ির কাছে মহানন্দা ও তিস্তায় প্রতি মিলি লিটারে-এ যথাক্রমে ১৪,০০০ এবং ৭,০০০ টিসিসি (টোটাল কলিফর্ম কাউন্ট)। জলপাইগুড়ির কাছে করলা এবং আলিপুরদুয়ারের কালজানি নদী, দুটিতেই ১৪,০০০ টিসিসি। প্রতি মিলি লিটারে-এ গ্রহণযোগ্য মাত্রা মাত্র ৫০০ টিসিসি। নমুনা সংগ্রহ হয়েছে ২০১৫-তে।

দিনের পর দিন আবর্জনা ফেলে, কালজানি এবং করলা-কে বিষাক্ত করেছে স্থানীয় মানুষ। কীটনাশকে আক্রান্ত করলায় ২০১১-তে মাছ মরে ভেসে উঠেছিল। আসে কোথা থেকে কীটনাশক? করলা আর কালজানির আশপাশের চা-বাগানে কি কীটনাশকের ব্যবহার বেড়েছে?

মহানন্দা-কে বিষাক্ত করেছে, স্থানীয় মানুষ এবং শিল্প-কারখানার বর্জ্য। গত বিধানসভা নির্বাচনের সময় যখন ডুয়ার্স চষে বেড়াচ্ছিলাম আমি আর সাংবাদিক প্রদোষ সাহা, তখন সব রাজনৈতিক দলের নেতারা মহানন্দার সংস্কার

> ‘পৃথিবীর যে কোনও অঞ্চলেই পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হলে সবার আগে পরিবেশ ছোবল মারে পশু-পাখি- পোকামাকড়-গাছপালা আর ফলপাকুড়ের ওপর। এগুলো সব প্রাকৃতিক সতর্কবার্তা। সাবধান না হলে প্রাকৃতিক রোষে শ্মশান হয়ে যাবে, একটার পর একটা অঞ্চল। বিবর্ণ ম্যান্ডারিন এবং নেওড়া ভ্যালির কোর এরিয়া ছেড়ে বারবার বেরিয়ে আসা বাঘ-ও এমনই এক প্রাকৃতিক ইঙ্গিত। গত পঞ্চাশ বছরে ডুয়ার্স-তরাই অঞ্চলে পরিবেশের বিপুল পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু ঠিক কী কী পরিবর্তন হয়েছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ রিপোর্ট আমাদের কাছে নেই।’

নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। তারপর নির্বাচন শেষে আবার গড্ডালিকা প্রবাহে গড়াগড়ি। এটাই উত্তরবঙ্গের নেতাদের স্বভাব। একজনও কি নেতা নেই যিনি বুক চিতিয়ে বলবেন, বিদেশি পর্যটক টানতে, কোচবিহার-কালিম্পং যদি পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র গতি হয় তাহলে ডুয়ার্স-তরাইয়ের পরিবেশ ও মানুষের কথা আগে ভাবতে হবে। তারপর পর্যটন। আর এই কথাটাই গোটা পৃথিবী বলছে এখন। ভেল্কিবাজির পর্যটনে কেউ আর বিশ্বাস করে না। পর্যটনকে টেঁকসই বা সাসটেইনবল হতেই হবে। আর প্রকৃতি যেখানে প্রবলভাবে সক্রিয় সেখানে-তো একথা প্রবলভাবে মেনে চলতে হবে। কেন তিস্তার ওপর এত বাঁধ ও জলাধার? নদীবাঁধ ও জলাধার নির্মাণে কাদের পকেটে পয়সা ঢোকে? এক শ্রেণির ব্যবসায়ী ছাড়া স্থানীয় পরিবেশ ও মানুষের কোনও লাভ হয়? বরং অপরিণামদর্শিতা, মরু ভাল্লুকের মতই একটা গোটা অঞ্চলের জীবন-জীবিকাকে প্রতিদিন, ধীরে ধীরে এগিয়ে দেয় নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে।

সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গে তিস্তা বসে আছে একটি সক্রিয় ‘ফল্টলাইন’-এর ওপর। সামান্য দোলায় ভেঙ্গে চুরমার হবে সব নদীবাঁধ। আগামীদিনে, বরফ দ্রুত গলে যাওয়ার জন্য জল বাড়বে তিস্তায় এবং পরবর্তী ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের ধাক্কা সামলানোর জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার এখনি সঠিক সময়।

ডুয়ার্স ও ডুয়ার্সের মানুষ নিয়ে সত্যি ভালবাসা থাকলে ভাল করে চোখ বুলিয়ে নিন, ২০১৫-তে নেপাল ভূমিকম্পের পর, ২০১৬-তে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ শেষে কী ছিল, রেবেকা বেনডিক (অধ্যাপক ভূবিজ্ঞানী, মন্টানা বিশ্ববিদ্যালয়)-এর গবেষণায়! আগামীদিনে হিমালয় ও হিমালয়সংলগ্ন এলাকার ভূমিকম্পকে উনি ‘মেগাকোয়েক’ বলছেন, যার মাত্রা হবে ৮-এর ওপর। ২০১৭-তে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা গবেষণা শেষে ড. রেবেকা বেনডিকের সঙ্গে পুরোপুরি একমত।

তিস্তা নিয়ে ছেলেখেলার মাশুল ডুয়ার্স-কে দিতেই হবে। একমাত্র কংক্রিট নির্ভরতার বালখিল্য ভাবনা থেকে দূরে টেঁকসই উন্নয়নের পথে হাঁটলে ক্ষতির পরিমাণ কিছুটা হলেও কমতে পারে। কোচবিহার থেকে কালিম্পং,

যে কোনও উন্নয়ন এবং পর্যটনকে সাসটেইনবল হতে হবে, এলাকার মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণে।

এলোপাথাড়ি কংক্রিট উন্নয়নে দিশাহীন জাপান

ঝাঁ চকচকে কংক্রিট উন্নয়নের অহঙ্কার এবং আমেরিকান মডেলে অবিরত নির্মাণের ‘গভীরতর অসুখে’ আক্রান্ত জাপান, —কি বেকায়দাতেই না পড়েছিল! কিন্তু তারপরেও, জাপানোলজিস্ট এবং আমেরিকান লেখক আলেক্স কের-এর সাসটেইনবল পর্যটনের ভাবনা, জনশূন্য শ্মশান হয়ে যাওয়া এক শহরকে আবার প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছে। পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আছে আলেক্স এর লেখা ‘লস্ট জাপান’ বই-এ।

আমেরিকান নৌসেনা অফিসার বাবার সূত্রে প্রথম প্রেম জাপানের সঙ্গে। তারপর বারবার ঘুরেফিরে জাপান যাত্রা। আমেরিকার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জাপানবিদ্যা এবং অক্সফোর্ড থেকে চিনবিদ্যা শেষ করে জাপানে পাকাপাকিভাবে বাসা বাঁধেন ১৯৭৭-এ। কিন্তু তার আগেই ১৯৭০-এ হাতেকলমে স্বপ্ন বোনা শুরু।

প্রযুক্তি আর দেদার কংক্রিট উন্নয়নে মশগুল জাপানে তখন ভূতের নৃত্য চলছে। শহরে প্রবল উন্নয়ন। গ্রামে বা ছোট শহরে কাঁচকলা। আমেরিকার ইন্ধনে জাপান তখন উন্নয়নের শো-পিস। সোভিয়েত রাশিয়া, ভিয়েতনাম, কোরিয়া, চিন— সব জায়গায় তখন ‘কম্যুনিস্ট ভূত’ দেখছে আমেরিকা। একমাত্র বাঁচার উপায়, জাপান-কে নিজেদের নিয়ন্ত্রনে রেখে যদি জাপানের অর্থনীতি ও সামরিক শক্তিকে জোরদার করা যায়। তেমনটাই হল ১৯৪৬-১৯৫৪ এবং ১৯৫৪-১৯৭২, এই দুটি পর্যায়ের উন্নয়নে জাপান পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তি হয়ে উঠল কিন্তু দিশাহীন, অনর্থক, শহরকেন্দ্রিক কংক্রিট উন্নয়নের ধাক্কায় ছোট শহর এবং গ্রাম তখন জনশূন্য-শ্মশান হয়ে গেছে। ঘরবাড়ি, গাঁ-গঞ্জ ছেড়ে সবাই তখন বড় শহরে চলে গেছে রোজগারের আশায়। জাপানে এমন জনবসতিকে বলে ‘শাটার টাউন’।

২০০৩-এ আলেক্সের গবেষণায় প্রথম বোঝা যায় জাপানে এমন ‘শাটার টাউন’-এর সংখ্যা অগুনতি।

ইয়া উপত্যকায় আলেক্স কের

আলেক্সের বয়স তখন কুড়ি। ১৯৭০ সাল। শিককু দ্বীপে পাহাড়ে ঘেরা তকুশিমা-র ইয়া উপত্যকায় পৌঁছে যান। এলাকার মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে গেছে বহুদিন আগে। সেখানেই আলেক্স খুঁজে পান তার স্বপ্নের ‘সাংগ্রি-লা’।

তিনশো বছরের পুরনো একটি জরাজীর্ণ বাড়ি। ১৫০০ ডলারে জমিটুকু পান। তারপর শুরু সংস্কারের কাজ। কংক্রিটের ধারকাছ দিয়েও গেলেন না। জাপানের ‘কায়াবুকি’ নির্মাণের চিরাচরিত মালমসলা ব্যবহার করেই সংস্কার সম্পন্ন করলেন কিন্তু একটি প্রাচীন গ্রামীণ

মালবাজার শ্রীমতিদের আনন্দ মেলায়

শ্রীমতি ডুয়ার্স

শীতের ভয়ংকর রূপ তখন ফিকে হতে শুরু করেছে সবে, তাই বলে ঠান্ডার প্রকোপ কমে নি। সেই শীতকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে শ্রীমতিরা জানুয়ারির ২৩ ও ২৪ এই দুটো সন্ধ্যে আনন্দে নাচে গানে মিলে মিশে গেলেন মালবাজারের কিশলয় মাঠে। নাগরাকাটা জলপাইগুড়ি কোচবিহার থেকে শ্রীমতিরা এসে যোগ দিয়েছিলেন সেই আনন্দ যজ্ঞে।

লাউ শাকে টাকি মাছ

ডুয়ার্সের ডিশ

উপকরণ: একটু বড় সাইজের টাকি মাছ ৪টে, কচি রাই শাকের ৮/১০টি পাতা, আদা কুচি ১ চা-চামচ, রসুন কুচি ১ চা-চামচ, পেঁয়াজ কুচি বড় ১টা, টম্যাটো ১টা বিচি ফেলে ছোট করে কাটা, ধনে পাতা আন্দাজ মতো, সরষের তেল ৫/৬ চা-চামচ, লবণ আন্দাজ মতন।

পদ্ধতি: মাছগুলো ভাল করে কেটে মাথা বাদ দিয়ে কাটতে হবে তারপর লবণ জলে ধুয়ে সেদ্ধ করতে হবে, ১০ মিনিট সেদ্ধ হওয়ার পর মাছগুলো ঠান্ডা হলে কাঁটা বেছে নিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে মাছের কোনও কাঁটা যেন না থাকে। কড়াইতে সরষের তেল দিয়ে দিন ও তেল গরম হলে কাঁচা লঙ্কা ফোরণ দিন তারপর একে একে আদা, রসুন, পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা কুচি দিয়ে ভাল করে নাড়াচারা করে কাঁটা ছাড়ান মাছটা কড়াইতে দিয়ে দিন ও ভাল করে কষিয়ে নিন। কিছুক্ষণ নাড়াচারা করে কুচনো রাই শাক দিয়ে দিন। শাক থেকে জল বের হয়ে মাছের সঙ্গে মিশে যাবে এবং সম্পূর্ণ রান্নাটা জল শুখিয়ে বেশ একটু মাখা মাখা হলে ধনে পাতা কুচি দিয়ে নামিয়ে নিন ও গরম বাসমতী চালের ভাতের সঙ্গে প্রথম পাতে খান, দেখবেন দুপুরের খাওয়াটা কেমন জমে যাবে।

শ্রাবণী চক্রবর্তী

বাড়িকে আজকের আধুনিক মন-মানসিকতা এবং অভ্যাসের সঙ্গে মিলিয়ে দিলেন। বাড়ির নাম দিলেন 'চিয়োরি'— বাঁশি বাড়ি।

জাপান সরকার তেঁতো মুখে বলেছিল তখন 'ওই গণ্ডগ্রামে কিন্তু কেউ যাবে না'। অম্লানবদনে আলেক্সের জবাব ছিল 'ঠিক আছে। কোনও অসুবিধে নেই। আমরা বিদেশি পর্যটক নিয়ে আসব'। কয়েক বছরের মধ্যেই হাজার-হাজার বিদেশি পর্যটক আসতে শুরু করল। নড়েচড়ে বসল তকুশিমা প্রশাসন। আলোচনায় বসল আলেক্সের সঙ্গে। একরাশ বিস্ময় নিয়ে ওদের জিজ্ঞাসা ছিল 'কংক্রিট দিয়ে আমরা চোখধাঁধানো সব নির্মাণ করেছি দেশে। তুমি এমন কী করেছ যে বিদেশি পর্যটকের ঢল নেমেছে চিয়োরি-তে?'

আলেক্সের সহজ উত্তর ছিল— "নাথিং স্পেশাল বা 'বিশেষ কিছু নয়'-এর চিরকালীন সহজ আকর্ষণ"।

একইভাবে ওজিকা দ্বীপে-ও কর্মকাণ্ড শুরু করতেই পর্যটকের ঢল। এরপর ৮টি বাড়ি সংস্কার করে ওচিয়াই-তে একটি ছোট্ট গ্রাম নির্মাণ। সব জায়গাতে সফল আলেক্সের একটি-ই সহজ তত্ত্ব, ঐতিহ্য-কে রেখে আধুনিক জীবনযাপনের ব্যবহার।

আনন্দের কথা, ১৯৮০ থেকে জাপানের পর্যটকরাই আলেক্সের সবকটি প্রোজেক্ট দখলে রাখে সারাবছর।

কোচবিহার থেকে কালিম্পঙে-ও এমনটা হতে পারে। আমরাও টেনে আনতে পারি দেশ এবং বিদেশের পর্যটকদের। কিন্তু আমাদের কাজটা আরও কঠিন। প্রথমত স্থানীয় মানুষকে সচেতন ও শিক্ষিত করতে হবে— ইকোটুরিজম-এর নামে ধান্দাবাজদের সামাল দিতে। দ্বিতীয়ত সাধারণ মানুষ যারা ইকোটুরিজম-এর নামে, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া বা উত্তরবঙ্গে গিয়ে যথেষ্ট পয়সাকড়ি দিয়েও সাপ-ব্যাং-মশা-মাছির সঙ্গে বসবাস করেছেন, গ্রামীণ পর্যটনের নামে দুপুরে কচু সেদ্ধ আর বিকেলে ঘাসপাতার বড়া খেতে বাধ্য হয়েছেন— তাদের সঙ্গে কথা বলে মুখোশ খুলে দিতে হবে ধান্দাবাজদের।

অশিক্ষিত, হঁচড়ে পাকা, অগুনতি উকুনে ভরা পেট অবধি আঁতেল দাড়ি নিয়ে যারা দিনের পর দিন সেবার নামে উত্তরবঙ্গের মা-মাটি-মানুষের অপমান করেছে, তাদেরকে হাতেনাতে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে— সরকার এবং গোটা দেশকে। প্রয়োজনে সাহায্য নিতে হবে ইউটিউব চ্যানেলের। পত্রিকা, চ্যানেল, আলোচনা— বিতর্ক সভা, সবকিছুতেই 'এখন ডুয়ার্সে'-এর একটাই লক্ষ্য। কোচবিহার থেকে কালিম্প— মানুষকে আত্মমর্যাদার ভাষা শেখানো। মাথা উঁচু করে যাতে সবাই বলতে পারে 'আমরা মেয়ে বেচতে যাব না কলকাতায়, কলকাতা আসবে আমাদের মেয়ের বিয়েতে।'

জয়ন্ত গুহ

(সমাপ্ত)

ডালিমটার

৩০ পাতার পর

উঠল। আমরা ব্রিজ দিয়ে, কেউ কেউ নদী দিয়ে হেঁটে পেরিয়ে গিয়ে গাড়িতে উঠলাম। দেওপ্রকাশজী বাইকে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন ওঁর বাড়িতে। বাড়ি পৌঁছলাম বারোটা নাগাদ। আমাদের ঘর দেখিয়ে দেওয়া হল। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, টান টান করে বিছানা পাতা, বাথরুমটা অবশ্য কমন। ওই বাড়ির লোকেরাও ওগুলোই ব্যবহার করেন। সেই বাথরুম নিয়েই একটু নাক শিটকে ছিল তুনাই, আমার ভাইয়ের মেয়ে। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে দেখে ওকে বললাম, নিজের বাড়ির বাথরুমখানাও কি এত পরিষ্কার হয় আমাদের? ভেবে দেখ। একটু বাদেই চা চলে এল। চা খেয়ে আমরা ভিউ পয়েন্টে চলে গেলাম। প্রাণ ভরে ছবি তোলার ধুম পড়ে গেল।

আমার ড্রাইভার এখন পরিবর্তিত হয়েছে ফটোগ্রাফারে। তিনি নিসর্গ বন্দিতে ব্যস্ত। ভাই, ভাইয়ের বৌ, তুনাই সেলফি তুলতে তুলতে প্রায় পড়েই যাচ্ছিল পাহাড় থেকে। সেদিন ছিল ২৮ ডিসেম্বর। কনকনে ঠান্ডা থাকার কথা, কিন্তু দুপুরের চড়া রোদে যথেষ্ট গরম লাগছিল আমাদের। লাঞ্চ সারলাম চিকেন দিয়ে। সঙ্গে ছিল ওঁদের নিজস্ব কিচেন-গার্ডেনে ফলানো সবজি আর স্যালাড। ঘারোয়া খাবারের আটপৌরে পরিবেশনায় এমন একটা লোকছন্দ ধরা পড়ছিল যে আমরা কখনও কখনও কুণ্ঠিত বোধ করছিলাম। শহুরে আদবকায়দাকে খানিকটা অভব্যতা মনে হচ্ছিল। কই আমরা তো বাড়িতে অতিথি এলেও এত যত্নআত্তি করি না যা ওরা পয়সা দিয়ে থাকতে এসে আমাদের সঙ্গে করছে! যাইহোক, খাওয়াদাওয়া সেরে একটু গা এলাতে ইচ্ছে করল সকলেরই। সন্ধেবেলা চা বর্জিত হল। অন্য পানীয়তে অন্যরকম লাগতে লাগল ডালিমটার।

দেওপ্রকাশজী বড্ড সাত্ত্বিক মানুষ। আমাদের সঙ্গে বসে নানান কাহিনি জানাতে লাগলেন আর আমাদের ভ্রমণ-পিপাসা বাড়াতে লাগলেন। আমাদের হাতে সময় নেই এবার, ফলে খুব শিগগিরি কবে আসা যায় তার প্ল্যান ভাজতে লাগলাম আমরা। ডিনার সেরে যখন ঘুমোতে গেলাম তখন রাত দশটা। দেওপ্রকাশজী লজ্জিত হয়ে কুণ্ঠিত হাসি মাখিয়ে বললেন, আপনারা শহরের লোক, এত তাড়াতাড়ি খাবার খাওয়ার অভ্যেস আপনাদের নেই, কিন্তু আমার মিসেস চাকরি করেন তো, ওঁকে সকাল সকাল রান্না সেরে আপনাদের ব্রেকফাস্ট দিয়ে অফিস ধরতে হবে, তাই একটু তাড়াতাড়ি না শুলে উঠতে পারবে না ভোরে।

শুনলাম, ডালিমটার থেকে 'পাঁচপুকরি' নাকি সাত কিলোমিটার পথ। কিন্তু সেখানে যেতে হলে পায়ে হাঁটা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। গাড়ি যাবে না। সেখানকার ডালিমগড়ের মতো ইতিহাস নেই, আছে কৌতূহলোদ্দীপক দেবতানির্ভর কাহিনি। কৈলাস ছেড়ে বারো বছরের জন্য মর্ত্যে ভ্রমণে এসেছিলেন শিব। জটায় গঙ্গা। চব্বিশ ঘণ্টায় একবার নাকি সেই জটা থেকে জল ঢেলে দিতে হত শিবকে। এখানে যখন এলেন, তখন পাঁচদিনে পাঁচবার জটা থেকে জল ঢেলে ফেলতে হয়েছিল তাঁকে। সেখান থেকেই সৃষ্টি হল পাঁচটা পুকুর। নাম হল 'পাঁচপুকুরি'।

চারটির জল এখন শুকিয়ে গেছে অনেকটাই কিন্তু পঞ্চমটি অলৌকিক। পাহাড়ের ঠিক মাথায়, যেখানে জলের কোন উৎস নেই, এমনকি জলের উৎস বোঝবারও কোনও উপায় নেই, সেখানে রয়েছে এই গভীর পুকুর। জল কোথা থেকে আসছে বোঝা যায় না অথচ প্রচুর জলে সারাবছর ভরপুর থাকে এই পুকুর। দুটো হাঁস নাকি পাহারা দিত এই পুকুর। একটা পাতা পড়লেও তা ঠোঁটে করে নিয়ে সরিয়ে দিত এই হংসযুগল। টলটল করত পরিষ্কার জল। একবার একটি ব্রিটিশ শিকারী পাখি শিকার করতে করতে চলে আসে এই পুকুরে। পুরুষ হাঁসটিকে মেরে ফেলে বন্দুকের গুলিতে। ফেরার পথে বুকে ব্যথা হয় এবং হৃদযন্ত্রের বৈকল্যে মারা যান সেই ইংরেজ। বিরহিণী হংসীও আর বাঁচেনি তারপর। এই ঘটনার পর থেকে কেউ আর এখানে পাখি শিকারের সাহস দেখায়নি। আজও গেলে 'ধোবিনী চড়ি' (আঞ্চলিক পাখি) দেখা যায়, যারা এই পাতা পরিষ্কারের কাজটি করে চলেছে নিরবচ্ছিন্ন ধারায়।

পরদিন দেওপ্রকাশজী আবার বাইকে পথনির্দেশকের কাজটি সারলেন পরিপাটি করে। ঝোরা পার করে দিলেন নিজে দাঁড়িয়ে থেকে। যেমন আমরা কোনও প্রিয় অতিথি অনেকদিন পর বাড়িতে এলে তাকে বিদায় জানাই ঠিক সেইভাবে। খানিক উৎকণ্ঠা, খানিক বিষণ্ণতা নিয়ে।

শ্বেতা সরখেল

ছবি: অতনু সরখেল

সুদীপ হোমস্টে

৯৬৭৯৭১২৯৪৯, ৯৫৪৭৯৫৭৫৩২

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় লেখা পাঠান

ডুয়ার্স সংক্রান্ত আপনার কোনও লেখা থাকলে পাঠান। আপনার লেখা সম্পাদকমন্ডলীর পছন্দ হলে এই পত্রিকায় তা ছাপা হবে। লেখার বিষয়বস্তুর উপর ছবি থাকলে অবশ্যই পাঠাবেন। লেখা পাঠানোর ঠিকানা 'আড্ডাঘর', মুক্তাভবন, মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি। অথবা মেল করতে পারেন নিচের মেল আইডি-তে editor.ekhonduars@ yahoo.com

এখন ডুয়ার্স

ডুয়ার্স আমার মাতৃভুমি

সীমান্তরেখার কাছে

কর্তার চাকরিসূত্রে যে জায়গায় থাকি সেখানে বাড়িতে আত্মীয়পরিজন এলে আশপাশে ঘুরতে নিয়ে যেতে ইচ্ছে হয় বৈকি। তবে ঘোরানোর জন্য এখানে শপিং মল, পার্ক বা গেম পার্লার নেই, তার বদলে আছে সবুজ খেত, বাংলাদেশ-ভারতের সীমারেখা আর মানুষের আন্তরিকতা ও ভালবাসা। শেষের দুটো জিনিসের জন্য মনে হয় চাকরিতে ট্রান্সফার শব্দটির প্রবেশ না হলেই তো পারত! এই তিন বছর একটি জায়গায় থাকার ফলে এই সহজ সরল পরোপকারি মানুষগুলোর সঙ্গে যে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তা ছেড়ে চলে আসবার সময় এক টানে ছিঁড়ে ফেলা যায়?

‘ক্যাম্পে ফিরে নিস্তব্ধতার শব্দ আর তিস্তার কুলকুল আওয়াজে আওয়াজে মিশছিল কালী মন্দিরে সন্ধ্যারতির মন্ত্রোচ্চারণ। সেখানে কালী মা-কে ঘিরে রয়েছে গুরু নানক, সন্তোষী মা, যিশুখ্রিস্ট, হজরত মহম্মদ আরও কত কে, গুণে শেষ হবে না। মনে হয় তাকিয়েই থাকি শুধু। ধূপধুনো আর কুয়াশায় ঢেকে গেল চারিপাশ।’

তেমনই এক সুন্দর দিনের অভিজ্ঞতা হল গত ১৮ জানুয়ারি। এখানে অর্থাৎ মেখলিগঞ্জে আসবার পর থেকেই কমান্ডান্টজি বহুবার তার ক্যাম্পে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, কিন্তু কোনও কারণে হয়ে ওঠেনি, তিনবিঘা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এসেছি। কিন্তু এবার সদলবলে গিয়ে হাজির হলাম তিনবিঘা। সেখান থেকে ডেপুটি কমান্ডান্ট দীপক রাঠিজি হাসিমুখে আমাদের স্বাগত জানালেন। তারপর বললেন আগে সর্বশেষ বর্ডার আউটপোস্ট হেমন্থ-এ ঘুরে এসে আবার তিনবিঘা আর তার সংলগ্ন জায়গা ঘুরিয়ে দেখাবেন। আমরাও গাড়িতে উঠে পড়লাম। রাঠিজি-ও তার জিপসিতে উঠে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলতে শুরু করলেন। তিনি আগেই দুঃখপ্রকাশ করলেন যে কমাডান্ট সাহেব একটা জরুরি মিটিংয়ে রানিনগর চলে গিয়েছেন। এটা অবশ্য সকালেই আমার কর্তাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে উনি বেরিয়ে যাচ্ছেন, ওঁর বদলে ডেপুটি কমান্ডান্টজি আমাদের সঙ্গে থাকবেন।

‘এক বাত সোচকে বহুত আচ্ছা লগতা হ্যায় কে হামলোগ যব সারা রাতভর জাগতে হ্যায়, তো দেশবাসী সোতে হ্যায়!’

বলছিলেন রাঠিজি। যিনি সেদিন দুপুর থেকে সন্ধে আমাদের সঙ্গ দিলেন, আতিথেয়তায় ভরিয়ে তুললেন। ফেসবুক, হোয়াটস্‌অ্যাপের জগৎ থেকে বের করে উপহার দিলেন কিছু সোনালি সময়। তিনবিঘা থেকে আরও ভেতরে, সর্বশেষ বিএসএফ ক্যাম্প, যেখানে তিস্তা বাংলাদেশ আর ভারতকে ভাগ করে দিয়েছে; সেখানেই সময় কাটালাম দুপুর থেকে পড়ন্ত বিকেল। কথা হল, গল্প, হাসি, তিস্তার সদ্য ধরা মাছভাজা আর ওদের সবজি খেতের ফ্রেশ ভেজ পকোড়া সহযোগে। সুন্দর গোছানো রঙিন তোয়ালে মোরা চেয়ার পাতা নৌকায় তিস্তা সফর যেন এক স্বর্গীয় অনুভূতি। সোনালি জলে পানকৌড়ির দল খেলা দেখাল একের পর এক। আহা! এ দৃশ্য দেখার জন্য বারবার ফিরে যেতে মন চাইবে জানি। ক্যামেরাবন্দি করলাম কিছু সুন্দর মুহূর্ত, তবে পরক্ষণেই মনে হল থাক ক্যামেরা, মোবাইল আর যাবতীয় ইলেক্ট্রনিক গ্যাজেটস, এই নয়নাভিরাম দৃশ্য পান করার মধ্যে এক অদ্ভুত ভাল লাগা আছে যা ফটোতে দেখে অনুভব করা কোনওভাবেই সম্ভব নয়, প্রকৃতিকে আঁচলে ভরে যদি নিয়ে আসতে পারতাম!

ক্যাম্পে ফিরে নিস্তব্ধতার শব্দ আর তিস্তার কুলকুল আওয়াজে আওয়াজে মিশছিল কালী মন্দিরে সন্ধ্যারতির মন্ত্রোচ্চারণ। সেখানে কালী মা-কে ঘিরে রয়েছে গুরু নানক, সন্তোষী মা, যিশুখ্রিস্ট, হজরত মহম্মদ আরও কত কে, গুণে শেষ হবে না। মনে হয় তাকিয়েই থাকি শুধু। ধূপধুনো আর কুয়াশায় ঢেকে গেল চারিপাশ।

সর্বশেষ আড্ডা হল ‘বিওপি (বর্ডার আউটপোস্ট) ভীম’-এ। রাঠিজির নিজস্ব ক্যাম্প এটি। আমাদের না নিয়ে গিয়ে উনি ছাড়লেন না কিছুতেই। যেখানে রাজস্থানের রাঠিজির রেসিপি শিখে স্পেশাল ক্যাপুচিনো বানিয়ে দিল তামিলনাড়ুর গোলাপকৃষ্ণন, তাও আবার মালাই মারকে!! রাঠিজির মায়ের হাতে তৈরি ক্ষীরের গুজিয়া আমার মতো মিষ্টিবিদ্বেষী মানুষেরও মন গলাতে বাধ্য করল, সঙ্গে হোমমেড আলু ভুজিয়া। বাগানে বসে কুয়াশামাখা শান্ত পরিবেশে অনেক গল্প করলাম। ভারতের প্রতিটি সীমান্ত চষে ফেলা মানুষটির অভিজ্ঞতার ঝুলি উপরে দিলেন, আমরা সমৃদ্ধ হলাম বলাই বাহুল্য। শুনতে শুনতে ঘড়ির কাঁটার কথা বেমালুম ভুলে গেলাম। কথা হল কাশ্মীর প্রসঙ্গ, সঞ্জয়লীলা বনসালির ‘পদ্মবত’ সিনেমা নিয়েও।

পরিবার থেকে দূরে থাকার জন্য ‘গেস্টস আর লাইক হেভেন টু দেম’ এই কথাটি বারে বারে বুঝিয়ে দিলেন। নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পেরে আমরা আপ্লুত, শহরের ক্যাঁচক্যাঁচি, গ্যাঞ্জাম, গুগল, ইউটিউবে ভিডিও ডাউনলোড এই সমস্ত কিছুকে নস্বরে পেছনে ফেলে দিতে সক্ষম এইসব সোনালি বিকেল। এমন সময়গুলোর রেশ রয়ে যায় আজীবন, ভোলা যায় না কিছুতেই।

হিমি মিত্র রায়

নানান বচন, গ্রীষ্মলোচন

উত্তরবঙ্গের বাতাসে এখনও শিরশিরে ভাব আছে কিন্তু দক্ষিণবঙ্গে তিনি প্রায় বিদায় নিয়েছেন। সূর্যদেবের মেজাজ রোজই এক-দু' ডিগ্রি করে বাড়ছে। আগামী সাত-আট মাসে তাঁর প্রভাবে প্রাণশক্তির লোডশেডিং ঘটবে আমজনতার। বিশেষ করে উত্তরের সেইসব মানুষদের যাদের দক্ষিণের এই ঘেমো গরমের সঙ্গে পরিচয় নেই। এদের অনেকেরই স্কুল জীবনটা পাখা ছাড়াই দিব্যি কেটেছে। কর্মজীবনে কলকাতায় এসে লেখকের সাক্ষাৎ হয়েছিল সেই ফোস্কা পড়া গরমের সঙ্গে। এই গরমের হাত থেকে বাঁচতে কোনও এক সুভানুধ্যায়ী অবশ্য দিনে বহুবার স্নান করার নিদান দিয়েছিলেন। জীবনের প্রথম সিরিয়াল শুটিংয়ে গিয়ে আলাপ হল গণ্যমান্য অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গে, যাদের মধ্যে কারও কারও মগজ ছিল কম্পিটারের মতন। এবারের পর্বে তারই স্মৃতিচারণ।

এক হপ্তা আগে অবধি যে লাল অক্ষর রোজ ভোর বেলায় পনেরো থেকে সতেরোর মধ্যে জ্বলজ্বল করতো, এই উইকে দেখছি সেটাই দড়াম করে উনিশে চড়ে গেছে। মানে, আমার বাড়ির কাছাকাছি অবস্থিত একটি ডিজিট্যাল টেম্পারেচার বোর্ডের কথা বলছি। রোজ সকালে মর্নিংওয়াক ফেরত যে পথ দিয়ে বাড়ি ফিরি, সেখানে এক সুসজ্জিত গৃহের সদর দরজার ঠিক ওপরেই এই জিনিষটি টাঙিয়ে রাখা আছে। বসত বাড়ির দরজায় তাপমাত্রার ম্যাপ খাটানো কি ধরনের ফ্যাশন, কে জানে! এক হতে পারে যে, বাড়ির মালিক কারো থেকে এই যন্তরটি মুফতে উপহার পেয়েছেন। কিংবা এমনও হতে পারে যে হয়ত কাউকে ধার দিয়ে সেই টাকা ফেরত পাননি। নাকের বদলে নরুণ পেয়েছেন।

এমন যাই হোক কিছু একটা উনিশ-বিশ কারণ হবে। কিন্তু বোর্ডের ওই লাল অক্ষরকে উনিশ ছুঁতে দেখে আপাততঃ একটাই বাক্য বলার জন্য মুখ আমার নিশপিশ করছে... এই এল বলে সে, সদর্পে রুদ্রমূর্তিতে!

বিশদ ব্যাখ্যায় বলতে হয়, সে আসবে পুরো লটবহর সমেত। এবং তারপর গ্যাঁট হয়ে জাঁকিয়ে বসবে, মোটামুটি আগামী আট-নয় মাসের জন্য। ফেব্রুয়ারির শুরুতে এখন অবধি মিইয়ে পড়ে মিউ মিউ করছে যে সূর্য, আচমকা সে তখন হয়ে উঠবে চূড়ান্ত প্রতাপশালী। বাড়িতে গাড়িতে এ-সি নেই যাদের, তাদের সবাইকে তপ্ত শ্বাসের আঁচে চাবকে লাল করে ছাড়বে। কারণ, আসন্ন গ্রীষ্মকাল, সে বাবদে চিরস্থায়ী ভাবে অবাধ ছাড়পত্র দিয়ে

রেখেছে তাকে।

উত্তরবাংলা থেকে দক্ষিণ বাংলায় এসে, এক ধাক্কায় গ্রীষ্মের এই নবরূপকে চাখতে হলে, যে কেউ প্রথম দফাতে হকচকিয়ে যাবে। অতিরিক্ত আর্দ্রতায় পূর্ণ বত্রিশ কী তেত্রিশ ডিগ্রীর সে গরম যে কী অসহ্য প্রকৃতির, তার একটি পূর্বাভাষ আমি প্রথম শুনেছিলাম এ-সি কলেজের এক বন্ধু, সুকল্যাণের মুখে। মে মাসের গরমে কী যেন একটা ইন্টারভিউ দেবে বলে সে কলকাতায় এসে কোনও এক আত্মীয়ের বাড়িতে উঠেছিল। এক রাত সেখানে লোডশেডিং-এ গরম খেয়ে প্রথম ধাক্কাতেই তার আলু সেদ্ধ দশা। এবং পরদিন সকালে ডালভাত খেয়ে পথে বেরিয়ে আধঘণ্টার বেশি আর বাস জার্নি সইল না। অচিরেই ভিড় ঠাসা সেই বাসকে তার মনে হতে লাগল আস্ত একখানা তপ্ত ওভেন। যে পরিবেশে ঘামতে ঘামতে, আচম্বিতে সমস্ত প্রাণশক্তির এমন লোডশেডিং ঘটল, যে তখন সে বাস থেকে নামতে পারলে বাঁচে! এবং শেষে মাঝপথেই কোনও মতে নেমে, হাঁসফাঁস করতে করতে এক গাছতলাতে বসে অনেকক্ষণ ধরে বমি করার পর, তবে আবার সে সম্বিত ফিরে পায়। ততক্ষণে যথারীতি ইন্টারভিউয়ের সময় পেরিয়ে গেছে।

গায়ে ফোস্কা পড়া সেই জীবন্ত বর্ণনা শুনে, আমার তৎক্ষণাৎ দুটি কথা মনে হয়েছিল। এক নম্বর হল, কী প্রকারের অভিযোজন প্রক্রিয়ায় কলকাতার বাসিন্দারা হিট প্রুফ হয়ে থাকে? কারণ সেই কায়দা রপ্ত না করে ওই উইকেটে টেঁকা অসম্ভব! আর দু নম্বর হল, এতদিনে দিব্যা মোক্তানের মন্তব্যের যথার্থতা আমি খুঁজে পেলাম!

দার্জিলিং ইউথ হস্টেলের ওয়ার্ডেন, মিঃ মোক্তানের ছোট ছেলে দিব্যা। সাবেক গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের দুর্ভাগ্যজনক বলি, এক স্বল্পবাক ঝকঝকে তরুণ। তার সাহায্য না পেলে, আমাদের কলেজ জীবনের আনাড়ি বন্ধু দলটি কিছুতেই প্রথম চেষ্টাতেই সান্দাক ফু ট্রেক কমপ্লিট করতে পারতাম না। সেই অর্থে, জীবনের এক অতি স্মরণীয় অভিজ্ঞতার কারিগর মানি তাকে আমি, আজও।

সেবার কালিপোখরির জমাট কুয়াশায় ওর পাশে বসে যখন জিরিয়ে নিতে নিতে জলের বোতলে চুমুক দিচ্ছিলাম, দিব্যা বলেছিল, প্লেইনসে যেতে একদম ভাল লাগে না আমার। কেন জানো? তোমাদের ওখানে খাবার জলটাই এমন ঠাণ্ডা হয় না! শিলিগুড়িতে তাই তো আমি তো এক বেলার বেশি টিকতে পারি না।

কলকাতা সম্বন্ধে সুকল্যাণ খানিকটা বয়ান বদলে, প্রায় সেরকম সুরেই অভিযোগ করেছিল। ওর বক্তব্য... যেখানে গ্রীষ্মকালে, খোলা জায়গায় খালি গায়ে বসলেও, শরীরের কোনও আরাম হয় না... মাথায় থাক সেখানকার ইন্টারভিউ বা চাকরি!

এই কথা, জলপাইগুড়ির সে যুগের জেনারেশনের মুখেই মানায়। মানে, ধরুন সত্তরের দশকের শুরুর দিকে যাদের জন্ম। কারণ, তাদের স্কুল জীবনে সব সময় ক্লাসরুমে সিলিং ফ্যান অবধি থাকতো না। আমরা ক্লাস রুমে দুটো করে ফ্যান পেয়েছি, ক্লাস ইলেভেনে ওঠার পর। আর বাড়িতে তো গোটা গ্রীষ্মের ছুটি দিব্যি ফ্যান ছাড়া কাটিয়ে দেয়া যেত, স্রেফ খালি গায়ে থেকে।

এখনকার কথা অবশ্য আলাদা। দার্জিলিং কালিম্পং-এও এখন গরম কালে কোনও কোনও সময় পাখা বা এ-সির দরকার পড়ে। হোটেল বা টুরিস্ট লজগুলোতে তার পার্মানেন্ট ব্যবস্থা আছে, স্বচক্ষে দেখেছি।

কলকাতায় কাটানো আমার প্রথম গ্রীষ্মে, রাত দশটার সময়েও মেসের বিছানায় বসতে গেলে প্রথম প্রথম চমকে উঠতাম। কারণ

“আমার রুমমেট কাজল, প্রথম প্রথম তোশকের চারপাশে যত্ন করে গ্যামাক্সিন পাউডার ছড়িয়ে তারপর মশারি গুঁজে ঘুমোবার চেষ্টা করছে। কিন্তু তাতে যে বিশেষ কাজ হয় না, সেটা বোঝা গেল কয়েকদিন পর। কারণ এক রাতে দেখি, বিছানার বদলে নিজের সারা গায়ে সে ট্যালকম পাউডারের মত করে গ্যামাক্সিন ছড়াচ্ছে। তারপর দু হাত দিয়ে থাবড়ে থাবড়ে সেটা ভাল করে গোটা গায়ে মেখে নিয়ে শুরু করছে নিদ্রাদেবীর আরাধনা।”

বিছানার চাদরটি গায়ে রীতিমত ছ্যাঁকা মারতো। সন্তোষপুরের সেই মেসে, বিছানার গদি রাতভর এতই ঘামে ভিজে উঠতো যে সেই ঘামের স্বাদ নিতে গদির নীচে এসে বাসা বাঁধতো চাক চাক লাল পিঁপড়ে। আর কিছুদিনের মধ্যে সেই পিঁপড়ের দল, রক্তের স্বাদ পাওয়া বাঘের মতো, সরাসরি ঘুমন্ত মানুষের গায়ে এসে চড়াও হত গভীর রাতে। আমি দেখতাম তার প্রতিরোধে, আমার রুমমেট কাজল, প্রথম প্রথম তোশকের চারপাশে যত্ন করে গ্যামাক্সিন পাউডার ছড়িয়ে তারপর মশারি গুঁজে ঘুমোবার চেষ্টা করছে। কিন্তু তাতে যে বিশেষ কাজ হয় না, সেটা বোঝা গেল কয়েকদিন পর। কারণ এক রাতে দেখি, বিছানার বদলে নিজের সারা গায়ে সে ট্যালকম পাউডারের মত করে গ্যামাক্সিন ছড়াচ্ছে। তারপর দু হাত দিয়ে থাবড়ে থাবড়ে সেটা ভাল করে গোটা গায়ে মেখে নিয়ে শুরু করছে নিদ্রাদেবীর আরাধনা। ওই দৃশ্য দেখে সেদিন মনে মনে তারিফ করে ভাবছিলাম, বাঃ... এ তো হবুচন্দ্র রাজার ‘জুতো আবিষ্কারের’ একেবারে সময়োচিত নব সংস্করণ!

এই পিঁপড়েগুলোর অসভ্যতামো এক এক দিন সীমাহীন পর্যায়ে চলে যেতো। খুব সম্ভবত স্বাদ বদলের ইচ্ছেতে মাঝেমধ্যে তারা গিয়ে সেঁধিয়ে পড়তো হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখা প্যান্ট বা জামার ভেতর। সেই পোশাক পড়ে মেস থেকে বেরোনোর সময় একবারের জন্যেও তাদের অস্তিত্ব টের পাওয়া যাবে না। কিন্তু যাদবপুর থেকে ঠেলেঠুলে ভিড় লোকাল ট্রেনের পাদানিতে কোনওমতে পা ঠেকিয়ে উঠে একবার আপনি গেটে ঝুলে দেখুন! ছোটবেলা থেকে আজ অবধি যত গুপ্ত পাপ করেছেন, তার সবগুলোর শাস্তি একদম কড়ায় গণ্ডায় উশুল হয়ে যাবে তখুনি তখুনি, অগুনতি পিঁপড়ের কামড়ে। দু'হাতে তখন কামরার যা হোক একটি অংশ আঁকড়ে ধরে আপনি হয়ত কোনও মতে প্রাণের দায়ে ঝুলছেন। সুতরাং অতিষ্ঠ হয়ে উঠে যদি ভাবেন, একটু চুলকাবেন... সে ক্ষেত্রে, সাধের প্রাণটি হাতছাড়া না করে, সেটি হওয়ার জো নেই!

তো এইরকমই, একদিকে গরমের নিষ্পেষণে নাকাল হয়ে আর অন্যদিকে লাল পিঁপড়ের দংশনে মাকাল হয়ে, কলকাতার অস্থির গ্রীষ্মের সাথে আমার ধীরে ধীরে সমঝোতায় আসা।

গভীর সমুদ্র গর্ভের মাটিতে নেমে ডুবুরিরা যেমন জলের চাপে টলোমলো পায়ে হাঁটতে বাধ্য হয়, গরমের প্রকোপে এক এক দিন প্রায় সেরকমই শ্লথ হয়ে যায় আমার নড়াচড়া। হাত, পা, শরীর... সব কিছুরই মনে হয় আট-দশ গুণ করে ওজন বেড়ে গেছে। ওয়েট লিফটারের মতো নিজেই নিজেকে কষ্টেসৃষ্টে বয়ে নিয়ে নিয়ে যাই, অফিসে...। ফি হপ্তায় এক-দুবার সন্ধে বেলায় অফিস সেরে তখন যেতে হত বাগুইআটিতে ‘সোনার বাংলা’ সংবাদপত্রের দপ্তরে। সেখানে দৈনিক একটি কমিক স্ট্রিপ করতাম। জলপাইগুড়ির সরস গল্পকার বন্ধু শুভ্রর অনবদ্য সৃষ্টি, ‘গোয়েন্দা রম্বস রায়কত’। বলতে গেলে কলকাতায় আমার প্রথম রুজি রোজগার ওই রম্বস রায়কতের কল্যাণেই। কারণ, সে গল্প এক বাক্যে পছন্দ হয়ে গিয়েছিল সংবাদপত্রের সম্পাদক পুষণ গুপ্তের। আর সেই সূত্রেই আলাপ পুষণদার ভাই প্রচেতদা ও তুতো বোন মৌসুমীর সাথে। পুষণদা অতি গম্ভীর মানুষ। খুব দরকার না হলে তার ধারে কাছে ঘেঁষবার প্রশ্নই ছিল না। তবে বাকি দুজনের সঙ্গে বেশ গল্প আড্ডা হত ওই দপ্তরে গেলে। বিশেষত মৌসুমী ওই কাগজের ছোটদের পাতাটিও দেখত, যেখানে লেখা ও আঁকার সুযোগটির সদব্যবহার করতে আমি অতি উদগ্রীব ছিলাম। ফলে, কাজ সেরে ফাঁক মিললেই, ওর

টেবিলে গিয়ে আমার যতো আড্ডা জমানো।

সেই সময় এয়ার কন্ডিশনার মেশিনটি অলিতে গলিতে গজিয়ে ওঠা মোমোর দোকানের মত সর্বত্র দৃশ্যমান বস্তু ছিল না। সেই পত্রিকার দপ্তরে, একমাত্র ডিটিপি সেকশনে কম্পিউটারগুলোর জন্য এসি ছিল। বাকি অফিস জুড়ে, সম্পাদকের কেবিন থেকে শুরু করে নিউজ রুমের ঢালাও হলঘর, সবখানেই একমাত্র ভরসা সিলিং অথবা টেবিল ফ্যান। ফলে, মস্তিতে মত্ত হাতির মত ক্ষেপে ওঠা প্রখর গ্রীষ্মে, ক্রস কারেন্টে যে হাওয়া বইতো গোটা ঘরে, তার স্বাদ... জাস্ট ড্রাগনের রুষ্ট নিঃশ্বাস! বাইরে থেকে তেতে পুড়ে এসে সেই হাওয়ায় ঘাম শুকোবার চেষ্টা করা মানে, মহা যত্নে ভস্মে ঘি আটবার দশবার... যত বার সম্ভব। আমি যে কতবার চান করে ফেলি, এক এক দিন, নিজেই তার কাউন্ট হারিয়ে ফেলি...। নাহলে বাঁচা যায় এই গরমে?

এটা শুনে স্বাভাবিক ভাবেই মনে প্রশ্ন জাগে, দিনে এতবার স্নান করার জন্য কি ঘাড়ে করে একটা বাথরুম বয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়াব? এমনিতেই আমাদের মেসে জলের জোগান আসে টাইম কল থেকে। যার মেয়াদ দিনে দু' ঘণ্টা মোটে। সকালে আটটা থেকে নটা। আর বিকেলে চারটে থেকে পাঁচটা। সকালে অপিস টাইমে ওইটুকু সময়ে লাইন দিয়ে গোটা বাড়ির যত ভাড়াটে, তারা সবাই একে একে স্নান করে। একদম মিনিট মেপে মেপে সে স্নান। অঙ্কে

> আমি প্রায় চার পাতার একটা সিন হাতে করে নিয়ে এসেছিলাম। রীতাদির বিপরীতে সেই দৃশ্যে ছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। তড়িঘড়ি নিজের কপিটার দিকে হাত বাড়িয়ে সৌমিত্রবাবু বললেন, দাও বাপু, একটু সময় নিয়ে নিজের লাইনগুলো দেখে নিই। রীতার মুখস্থ শক্তির সঙ্গে যথাযথ পাল্লা দিতে হবে তো! ওর তো আবার মাথা নয়... একদম কম্পিউটার! বহু বছর পরে যখন নিজেই একটি সিরিয়ালের স্ক্রিপ্ট লিখতাম, সেখানেও দেখেছি রীতাদির স্মৃতিশক্তি কী অসাধারণ। শট শুরুর আগে একবার শুধু চোখ বুলিয়ে নিলেই স্ক্রিপ্টের গোটা পাতা কণ্ঠস্থ। আর ডায়লগ যদি চরিত্র উপযোগী চোখা ভাষার না হয়, তবে সেটের মধ্যেই বকুনি দিতে কসুর করতেন না।

ঢালা।

গায়ে সেঁটে থাকা ঘর্মাক্ত ভেজা জামাখানা দেখিয়ে একদিন কথাটা বলেই ফেলেছি মৌসুমীকে। এবং সঙ্গে জুড়ে দিয়েছি সুকল্যাণের বিবরণ শুনে আমার মনে জাগা সেই আদি প্রশ্নখানাও,

—এই তাপের প্রতাপ কী করে তোমাদের সয়ে যায় বাপু, একটু বলবে? আমার তো অ্যাডজাস্ট মোটেই হচ্ছে না। বরং দিন কে দিন যেন জাস্ট ব্যাড দশা হয়ে দাঁড়াচ্ছে!

মৌসুমী মাথা নিচু করে, কলমে খসখস শব্দের ঝড় তুলে কপি লিখছিল। মাথা না তুলেই বলল,

—কেন? স্নান করবে। তাহলেই সব ঠাণ্ডা!

—স্নান আবার একটা নিদান হল নাকি?

আমি অবাক হয়ে যাই! এবং একটু বিরক্তও। আমাকে এমন সাদামাটা সমাধান গছিয়ে দেবে ভেবেছে? নাকি গায়ে ঘামের দুর্গন্ধ পেয়ে সন্দেহ করছে আমি অস্নাত? তাই বললাম, —স্নান তো রোজই করছি। সকালে সে কারবার জল দিয়ে। দিনভর তারপর ঘামে ঘামে!

—বার বার করবে।

মৌসুমী চোখ তুলে অল্প হেসে বলল, দিনে একটু ভুলচুক হয়েছে কী, কেউ না কেউ ঠিক বাদ পড়ে যাবে! আর বিকেলের জলের নাগাল, একমাত্র ছুটির দিন বাদে পাব কোথা থেকে? সুতরাং মৌসুমীর ওই সাজেসান শুনে প্রথমে আমাকে বাজে ধরনের একটা বোকা হাসি হাসতে হল। আর, তারপর চালাক সাজার চেষ্টা করে বললাম, কাউন্ট আমিও হারিয়ে ফেলতাম এক এক সময়, জানো। আমাদের নর্থ বেঙ্গলের শীতে।

—শীতে? এর মধ্যে আবার শীত এনে ফেললে কীভাবে?

—একটু উলটো পুরাণ করে নিলাম আর কি! কারণ নর্থ বেঙ্গলে যখন টানা কোল্ড ওয়েভ চলে, তখন স্নান করা মানে প্রায় আত্মবলিদান তো! দাঁতের বাদ্যির ঠকঠকানিতে চোয়ালে প্যারালাইসিস হওয়ার যোগাড়! তাই সেই রকম সময় কখনও কখনও এমন হয়, যে লাস্ট কতদিন আগে ঠিকঠাক স্নান করেছি, সেটারই কাউন্ট গুলিয়ে যায়!

মৌসুমী যা বোঝার বুঝে নিয়েছিল। জবাবে তাই মুচকি হেসে বলেছিল, ক্যালেন্ডারে দাগ দিয়ে রাখতে পারতে। তবেই তো সব কনফিউশন ক্লিয়ার!

তবে এটা মানতেই হবে, যে শীতের সঙ্গে যুঝতে ততোটা অসুবিধা নেই, যদি লেপের ওপর ডবল লেপ চাপানো যায়। কিন্তু গরমের ওপর ডবল গরমের প্রলেপ কাকে বলে, সেটা আমার মালুম হয়েছিল বৈশাখ মাসে শুটিং ফ্লোরে। টালিগঞ্জ পাড়ার আদি স্টুডিও যেগুলো, সেখানে শুটিং ফ্লোরগুলো বেশির ভাগই টিনের চালা দেওয়া প্রকাণ্ড গুদাম ঘর বিশেষ। তারই ভেতরে সেট তৈরি করে কিলো কিলো আলো জ্বালিয়ে শুটিং-এর কাজ চলে। তো, সেরকমই পরিবেশে যখন আমাদের কোম্পানির প্রথম সিরিয়ালের শুটিং শুরু হল, সেট-এ এসে প্রতিদিন মনে হত, একদম আগ্নেয়গিরির গর্ভ গৃহে প্রবেশ করছি। কলকাতায় এসি শুটিং ফ্লোর চালু হওয়ার আট-দশ বছর আগের সময় সেটা। তখন গরমের মোকাবিলায়, হেভি ডিউটি বিরাট আকারের গাদাখানেক স্ট্যান্ড ফ্যানের ব্যবস্থা থাকত সেট-এর ভেতরে। এবং তৎস্বত্বেও, প্রায় প্রতিটি টেকনিশিয়ানকেই কাঁধে একটি করে খাটো তোয়ালে ঝুলিয়ে রাখতে হত ঘাম মোছার জন্য। কারণ ফ্যানগুলোর তীব্র গোঁ গোঁ শব্দে ডায়লগ রেকর্ড করা অসম্ভব ছিল। ফলে শট শুরুর আগে সমস্ত ফ্যান বন্ধ করে দিতে হত। এবং অ্যাকশন থেকে কাট বলার মাঝের সময়টায়, নায়েগ্রা প্রপাতের মতো ঘাম ঝরে চলতো সবার শরীর জুড়ে।

ওই সিরিয়ালের পাইলট এপিসোড শুট করার সময় ডিরেকশন দিচ্ছিলেন সুপান্থদা, যিনি কেরিয়ারের শুরু থেকেই মৃণাল সেনের ছবিতে অ্যাসিস্ট করে এসেছেন। সিরিয়ালের জন্য যে গল্পটি বাছা হয়েছিল, তা ছিল নামী নেফ্রোলজিস্ট এবং সাহিত্যিক অভিজিৎ তরফদারের লেখা একটি উপন্যাস, 'মহাজাগতিক'। এটা সুপান্থদারই নির্বাচন ছিল। সরকারি হাসপাতালে সদ্য চাকরিতে যোগ দেওয়া এক ডাক্তারের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লেখা সেই উপন্যাস, টেলিভিশনের পর্দায় পাঁচশোর বেশি এপিসোড ধরে সম্প্রচারিত হয়েছিল অতি সসম্মানে। যদিও সিরিয়াল চলতে চলতে ডিরেক্টার বদলে যায় বেশ কয়েকবার।

যাই হোক, পাইলট এপিসোড শুট চলছিল রানিকুঠির কাছে এক ভাড়া বাড়িতে। সেই বাড়ির মালিক একদম কেতাদুরস্ত সাহেবী মানুষ। প্রথমদিন যখন সুপান্থদার সঙ্গী হয়ে তার সাথে কথা বলতে যাই, তিনি তখন লাঞ্চ করছেন। অবাক হয়ে দেখেছিলাম, ভদ্রলোক কী অবলীলায় কাঁটা চামচ দিয়েই কাঁটা বেছে বেছে পাবদা মাছ খাচ্ছেন! সে যেন রীতিমত শিল্প!

চারতলা বাড়ির ওপরতলার বিরাট হল ঘরে, ভাড়া করে আনা সরঞ্জাম দিয়ে সাজানো হয়েছে হসপিটালের ওয়ার্ড। মূল আর্টিস্ট, এক্সট্রা আর্টিস্ট এবং টেকনিশিয়ানদের ভিড়ে বিরাট সোরগোল সারা বাড়ি জুড়ে। আর আনাড়ি আমি অবাক বিস্ময়ে দেখছি কী করে ক্যামেরায় ধরা ফ্রেমটুকুর মধ্যে প্রপস আর ফার্নিচার সাজিয়ে, সাদামাটা একটা ঘরেই অবিকল

এখন ডুয়ার্স-এ বিজ্ঞাপন দিন

General Rates for Display Ads (INR)

Full Page, Colour:15,000
Full Page, B/W: 9,000
Half Page, Colour: 8,000
Half Page, B/W: 6,000
Back Cover: 30,000
Front Inside Cover: 20,000
Back Inside Cover: 20,000
Double Spread: 30,000

Special Rates for Local Trade only
Strip Ad, Colour: 6,000
Strip Ad, B/W: 4,000
1/4 Page Ad, Colour: 2,500
1/4 Page Ad, B/W: 1,500
1/6 Page, Colour: 1,500
1/6 Page, B/W: 1,000

Mechanical Details: Full Page Bleed {18.9cm (W) X 27.07 cm (H)}, Non Bleed {15.5cm (W) X 23 cm (H)}, Half Page Horizontal {15.5cm (W) X 11.2 cm (H)}, Vertical {7.5 cm (W) X 23 cm (H)}, Strip Ad Vertical {4.8cm (W) X 23 cm (H)}, Horizontal 15.5 cm (W) X 5.2 cm (H), 1/4 Page 7.5 cm (W) X 11 cm (H), 1/6 Page {4.8 cm (W) X 11.2 cm (H)}

Rates are effective from April 1, 2017 issue

বিজ্ঞাপন দিতে বা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
কলকাতা ৯৯০৩৮৩২১২৩
উত্তরবঙ্গ ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬

এখন ডুয়ার্স

> "এই কথা, জলপাইগুড়ির সে যুগের জেনারেশনের মুখেই মানায়। মানে, ধরুন সত্তরের দশকের শুরুর দিকে যাদের জন্ম। কারণ, তাদের স্কুল জীবনে সব সময় ক্লাসরুমে সিলিং ফ্যান অবধি থাকতো না। আমরা ক্লাস রুমে দুটো করে ফ্যান পেয়েছি, ক্লাস ইলেভেনে ওঠার পর। আর বাড়িতে তো গোটা গ্রীষ্মের ছুটি দিব্যি ফ্যান ছাড়া কাটিয়ে দেয়া যেত, স্রেফ খালি গায়ে থেকে।"

হাসপাতালের পরিবেশ তৈরি করে ফেলা হচ্ছে। ওই শেখার আগ্রহ আর উত্তেজনাতেই কী করে যেন অতি গরমের অস্বস্তিটাও ধীরে ধীরে ঠিক হজম হয়ে গেল আমার।

আর্টিস্টদের মেকআপ রুমে স্ক্রিপ্ট দিতে গিয়ে দেখি রীতা কয়রাল একটি চিনেমাটির বোল হাতে লাঞ্চ করছেন। তাতে শুধু নানা ধরনের কাটা ফল। আমার ঘর্মাক্ত এবং বিধ্বস্ত দশা দেখে তিনি বললেন,

—ডিহাইড্রেশনে মরতে চাস নাকি? আমার মত অনবরত ফল খা। দেখবি ঠিক খাড়া থাকতে পারবি।

আমি প্রায় চার পাতার একটা সিন হাতে করে নিয়ে এসেছিলাম। রীতাদির বিপরীতে সেই দৃশ্যে ছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। তড়িঘড়ি নিজের কপিটার দিকে হাত বাড়িয়ে সৌমিত্রবাবু বললেন, দাও বাপু, একটু সময় নিয়ে নিজের লাইনগুলো দেখে নিই। রীতার মুখস্থ শক্তির সঙ্গে যথাযথ পাল্লা দিতে হবে তো! ওর তো আবার মাথা নয়... একদম কম্পিউটার!

বহু বছর পরে যখন নিজেই একটি সিরিয়ালের স্ক্রিপ্ট লিখতাম, সেখানেও দেখেছি রীতাদির স্মৃতিশক্তি কী অসাধারণ। শট শুরুর আগে একবার শুধু চোখ বুলিয়ে নিলেই স্ক্রিপ্টের গোটা পাতা কণ্ঠস্থ। আর ডায়লগ যদি চরিত্র উপযোগী চোখা ভাষার না হয়, তবে সেটের মধ্যেই বকুনি দিতে কসুর করতেন না।

এখন অবশ্য আর কোনওদিন সেই বকুনি শোনার সুযোগ নেই। দু'হাজার সতেরোতেই কেমন হঠাৎ করেই দিদি চলে গেলেন, ড্রয়িং রুম ড্রামার সাজানো জগত ছেড়ে, কোন সুদূরের ঠিকানায়।

সুপান্থদাও আজ আর নেই বেশ অনেক বছর হল। শুধু ওনার মুখের সোজা সরল হাসিটা আমার মনে রয়ে গেছে। আর মনে আছে ঠাণ্ডা গরম নিয়ে বলা মৃণাল সেনের 'জেনেসিস' ছবির শুটিং-এর একটি গল্প। রাজস্থানে কোথাও সেই শুটিং চলছিল আউটডোর লোকেশানে। দিনে যেমন ঘিলু শুষে নেওয়া গরম, রাতে তেমনই হিম ঠাণ্ডা। গভীর রাতে একটি দৃশ্যের শুটিং চলছিল নাসিরুদ্দিন শাহকে নিয়ে। প্রবল ঠাণ্ডায় খালি গায়ে বৃষ্টিতে ভিজতে হবে তাকে। সঙ্গে ডায়লগ এবং কঠিন এক্সপ্রেশনও আছে। ফলে ওই ঠাণ্ডার মধ্যেও দারুণ মনঃসংযোগ করে অভিনয় করতে হচ্ছে। কিন্তু দু'-তিনবার টেক নিয়েও শট বারে বারে ভেস্তে যাচ্ছিল। কখনও ক্যামেরার সমস্যা তো কখনও লাইট।

প্রতিবার শট থেকে ফিরে কাঁপতে কাঁপতে গা মুছে সারা গায়ে সর্ষের তেল মালিশ করতে হচ্ছে নাসিরুদ্দিন শাহকে। শেষ পর্যন্ত তৃতীয়বারের পর, মেজাজ হারিয়ে রীতিমত গালাগাল বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে। ছুটে গেলেন দুই অ্যাসিস্টেন্ট ডিরেক্টর। কোনওরকমে তাকে শান্ত করে, টেক-এর জন্য রেডি করা হল।

আবার শুটিং জোনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। ক্যামেরা চালু হতেই রেন মেশিন অঝোর ধারায় জল ঝরাতে শুরু করল। এবং এইবারে একদম ঠিকঠাক শটটি কমপ্লিট হল নির্বিঘ্নে। কিন্তু মুখে 'কাট' বলার পর, রেইন মেশিন থামার আগেই সবাইকে হতবাক করে দিয়ে, স্বয়ং মৃণাল সেন জলের ধারায় নেমে এসে ভিজতে শুরু করে দিলেন।

—আরে দাদা...ক্যা কর রহে হো আপ... রুখিয়ে না দাদা!

নাসিরুদ্দিন শাহ ছুটে এসে তাকে থামাতে গেলেন। মৃণাল সেন এক হাত বাড়িয়ে তাকে নিরস্ত করে স্মিত হেসে তখন বলেছিলেন, নো... আই ওয়ান্ট টু ফিল দ্য চিল। ইটস রিয়েলি কোল্ড নাসির...। ইউ ডু হ্যাভ দ্য রাইট টু ফিল অ্যাংরি!

ওই কথার অর্থ ধরেই আবার খানিক উলটো পুরাণ করলে, আমার বেলায় বলতে পারি, সেরকমই একটা রাগের কারণ ছিল কলকাতার গরম। রাগ যত না গরমের ওপর, তার চেয়ে বেশি নিজের ওপর... নিজের সহ্যশক্তির অভাবের ওপর। তবে, ভাগ্যক্রমে সেই প্রথম গ্রীষ্মের কাছে আমার সহ্যশক্তি সম্পূর্ণ পর্যদুস্ত হয়ে পড়ার আগেই বর্ষা চলে এসেছিল। এবং সেই ঋতু বদলটাই শেষে যথেষ্ট ভরসার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রায় ভুলেই যেতে বসেছিলাম যে শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা কাকে বলে। বর্ষার পরশ অবশেষে আবার সে অনুভূতি ফিরিয়ে দিয়েছিল। সুতরাং, আজও আমি গ্রীষ্মলোচন সূর্যকে ডরাই বটে। কিন্তু মনে মনে জানি, টেনেটুনে এপ্রিল আর মে মাসটা কাটাতে পারলেই হল। তারপরেই জ্বালা থেকে মুক্তি আছে... মৌসুমি বাতাসে!

অভিজিৎ সরকার

(ক্রমশ)

ঐতিহ্যময় ‘স্টেট রেলওয়ে’-র ১২৫ পূর্তিতে

কেন ‘কোচবিহার মেল’ নয়?

কোচবিহারের কড়চা

দেবব্রত চাকী

অকস্মাৎ সংবাদপত্রের শিরোনামে উঠে এল দার্জিলিং মেল। অভিজাত এই ট্রেনটি নাকি নিউজলপাইগুড়ির পরিবর্তে আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে ছাড়বে— এরকম একটি সংবাদকে কেন্দ্র করে হঠাৎ করে সম্মুখ সমরে শিলিগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার। মিছিল-বিক্ষোভ-কনভেনশন কোনও কিছুই বাকি রইল না। এক কথায় দার্জিলিং মেলকে নিয়ে টানাপোড়েন। এই টানাপোড়েনের অংশীদার হল কোচবিহার। বিকল্প দাবি উঠল কোচবিহার থেকে, ‘বন্ধ হোক টানাপোড়েন। চালু হোক নতুন ট্রেন, নাম হোক কোচবিহার মেল’। ছাড়ুক নিউ আলিপুরদুয়ার থেকে, চলুক নিউ কোচবিহার-মাথাভাঙা-নিউ চ্যাংড়াবান্ধা-জলপাইগুড়ি রোড- নিউ জলপাইগুড়ি হয়ে শিয়ালদহ। সংবাদপত্র সরগরম। সোস্যাল মিডিয়ায় ঝড়। অতঃপর উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষের ঘোষণা, দার্জিলিং মেল যেভাবে চলাচল করছে সেভাবেই চলবে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস শিলিগুড়িতে। হতোদ্যম আলিপুরদুয়ার। কিন্তু চর্চায় উঠে এল ‘দার্জিলিং মেল’-এর সমকক্ষ ‘কোচবিহার মেল’-এর দাবি। সোস্যাল মিডিয়ায় যথেষ্ট মান্যতা পেল ‘কোচবিহার মেল’-এর দাবি। কেউ কেউ ভ্রু কোঁচকালেন। কেউ কেউ উপহাস করে বললেন, ‘কোচবিহার মেল’ না ‘কোচবিহার প্যাসেঞ্জার’! কিন্তু চর্চায় থাকল ‘কোচবিহার মেল’-এর দাবি। প্রশ্ন হল এ দাবির পেছনে যৌক্তিকতা কি? কেনই বা নামকরণের পটভূমিতে ‘কোচবিহার মেল’ উঠে এল? এর উত্তর খোঁজা জরুরি।

কোচবিহার প্রাক স্বাধীনতা পর্বে পরিচয় বহন করত ইংরেজ আশ্রিত করদ মিত্র রাজ্য হিসাবে। তারও পূর্বে অর্থাৎ ১৭৭৩ সালের পূর্বে স্বাধীন রাজ্য হিসাবে। এক কথায় ঐতিহাসিক ভূ-ভাগ কোচবিহার। এই কোচবিহার ভূ-ভাগে এক সময় রেল পরিষেবা চালুর লক্ষ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল ‘কোচবিহার স্টেট রেলওয়ে’। সেটা উনবিংশ শতকের শেষ দশকের কথা। কোচবিহার রাজ সিংহাসনে তখন মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর। কোচবিহার রাজ্যে রেল পরিষেবা চালু ও পার্শ্ববর্তী অবিভক্ত বঙ্গের সঙ্গে রেল যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে রাজ সরকারের পক্ষ থেকে ব্রিটিশ সররকারের কাছে প্রস্তাব পেশ করা হয়। শুরু হয় পত্র চালাচালি। আশা নিরাশার দোলায় দুলতে থাকে কোচবিহার রাজ্যে রেলপথ স্থাপনের বিষয়টি। এক্ষেত্রেও টানাপোড়েন কম হয়নি। অবশেষে ছাড়পত্র দেয় ব্রিটিশ সরকার। শুরু হয় রেলপথ স্থাপনের তৎপরতা। অবিভক্ত বঙ্গের রংপুর জেলার উত্তর প্রান্তের সীমান্ত স্টেশন মোগলহাট

> ‘কোচবিহার স্টেট রেলওয়ের’ আত্মপ্রকাশের ১২৫ বর্ষে কোচবিহার কি পেতে পারে না একটি সুপার ফাস্ট মেল ট্রেন? যার নামকরণ হতেই পারে ‘কোচবিহার মেল’। পাশ্ববর্তী নতুন জেলা আলিপুরদুয়ারেরকথা মাথায় রেখে তা নিউ আলিপুরদুয়ার থেকে ছাড়লেই বা ক্ষতি কি?

থেকে রাজধানী কোচবিহারকে সংযুক্ত করার প্রয়াস। প্রাথমিকভাবে মোগলহাট সংলগ্ন কোচবিহার রাজ্যের গিতালদহ থেকে কোচবিহারের উপকণ্ঠে তোর্সা নদীর ওপারে মানসাই (অধুনালুপ্ত) স্টেশন পর্যন্ত ১৮.৮২ মাইল দীর্ঘ রেলপথ স্থাপনের কাজ শুরু হয়। ২ ফুট ৬ ইঞ্চি গেজের লাইন স্থাপনের কাজ জোর গতিতে চলতে থাকে। রেলপথ নির্মাণের পর ১৮৯৩ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর মালগাড়ি চলাচলের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় ‘কোচবিহার স্টেট রেলওয়ে’র পথচলা। প্রথম দিকে কিছুদিন মালগাড়ি চলাচল করার পর ১৮৯৪ সালের ১ মার্চ চালু হয় যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল।

১২৫ বছরের ইতিহাস। ১২৫ বছর পূর্বে কোচবিহার স্টেট রেলওয়ের মাধ্যমে এই রেলপথের ও রেল পরিষেবার আত্মপ্রকাশ ইতিহাসের পটভূমিতে কি স্মরণীয় নয়? প্রাক্ স্বাধীনতাপর্বে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রেল পরিষেবা ইংরেজদের হাত ধরে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করে। ১৮৫৩ সালের ১৮ এপ্রিল ‘গ্রেট ইন্ডিয়ান পেনিনশুলা রেলওয়ের অধীনে বোম্বাই থেকে থানে পর্যন্ত ২১ মাইল যাত্রাপথে প্রথম ট্রেনগাড়ি ছুটতে শুরু করে। এরপর তা ক্রমশ দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। তদানীন্তন কালে বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যেও আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করে রেল পরিষেবা। কোলাপুর স্টেট রেলওয়ে, ঢোলপুর স্টেট রেলওয়ে, ময়ূরভঞ্জ স্টেট রেলওয়ে, পন্ডিচেরি রেলওয়ে ইত্যাদি রেল কোম্পানি গড়ে ওঠে।

কোচবিহার স্টেট রেলওয়ে আজ ইতিহাস। যেমন ইতিহাস ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানি, নর্দান রেল কোম্পানি কিংবা বেঙ্গল-ডুয়ার্স রেলওয়ে। উত্তর স্বাধীনতা পর্বে আজ প্রাসঙ্গিক উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, যা ভারতীয় রেলওয়ের একটি শাখা। প্রশ্ন হল ইতিহাসের সেই সূত্র ধরে ‘কোচবিহার স্টেট রেলওয়ের’ আত্মপ্রকাশের ১২৫ বর্ষে কোচবিহার কি পেতে পারে না একটি সুপার ফাস্ট মেল ট্রেন? যার নামকরণ হতেই পারে ‘কোচবিহার মেল’। পাশ্ববর্তী নতুন জেলা আলিপুরদুয়ারেরকথা মাথায় রেখে তা নিউ আলিপুরদুয়ার থেকে ছাড়লেই বা ক্ষতি কি? মেইন লাইনে যখন এত ট্রেনের ভীড় তখন এই মেল ট্রেন চলুক নিউ কোচবিহার স্টেশন হয়ে নতুন রেলপথে মাথাভাঙা-নিউ চ্যাংড়াবান্ধা-জলপাইগুড়ি রোড-এনজেপি (নিউ জলপাইগুড়ি) হয়ে শিয়ালদহ অভিমুখে। যাত্রী সাধারণের সুবিধার্থে থাকুক পর্যাপ্ত চেয়ারকার।

এরপর অদূর ভবিষ্যতে এই ট্রেন জলপাইগুড়ি রোড অতিক্রম করে রানিনগর দিয়ে ঘুরে যেতেই পারে জলপাইগুড়ি হলদিবাড়ির দিকে। চলতে পারে না বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে কলকাতা? ১৮৭৬ সালে চালু হওয়া শিয়ালদহ-রাণাঘাট-পোড়াদহ-পার্বতীপুর-হলদিবাড়ি-জলপাইগুড়ি রেলপথ ধরে আলিপুরদুয়ার কিংবা কোচবিহার থেকে কলকাতা যাবার স্বপ্ন বাস্তবতার মুখ দেখুক— এই প্রত্যাশা নিশ্চয়ই অন্যায় নয়? সময় এসেছে বোধহয় বিষয়টি নিয়ে ভাববার। তাই স্রেফ আবেগের বশবর্তী হয়ে দার্জিলিং মেলকে নিয়ে অযথা টানাপোড়েন কেন? বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে দ্রুত কলকাতা পৌঁছানোর লক্ষ্যে এই ভাবনার বাস্তবায়ণ জরুরি। হলদিবাড়ি থেকে চিলাহাটি লাইন পাতার কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। সুতরাং বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে কলকাতা যাবার স্বপ্ন আর বেশি দূরে থাকবে কেন?

আজ মেলা ভাঙার খেলা

মেলা যে উৎসবের অঙ্গ, মানুষের মেলবন্ধন সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। কবে কখন কোন মেলার সূচনা হল তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বলা সম্ভব নয়। তবে গবেষকদের মতে ভারতবর্ষের প্রাচীনতম মেলা হল হরিদ্বারের মেলা। আসলে বেশিরভাগ পুরনো মেলাগুলিই তৈরি হয়েছে নদীর পারে। যেমন কুম্ভমেলা বা গঙ্গাসাগর মেলা কিংবা কেন্দুলির জয়দেবের মেলা। খোলামেলা আনন্দই মেলার মূল ধর্ম। গ্রামবাংলার প্রান্তবাসীর তাই 'মেলাই' শব্দটি প্রয়োগ করেন। কখনও কোনও ধর্মীয় আচার, কখনও কোনও পার্বণ বা উৎসবকে কেন্দ্র করে জমে ওঠে মেলা। রাস, রথ, গাজন যে নামেই বসুক মেলা তার ভেতর থাকে অন্তর্গত টান। থাকে সমাজ সংস্কৃতির অন্তর্গত ক্রিয়াকর্ম।

মেলা সারা বছর ধরেই চলে। শীতকালটাই হল গ্রামীণ মেলার মরশুম। কারণ পৌষ মাসে মূলত যখন ধান কেটে, বেচে চাষির ঘরে কিছু টাকাপয়সা আসে তখনই মূল মেলাগুলো শুরু হয়। গাঁয়ে গঞ্জের এইসব মেলায় সমবেত হয় প্রান্তিক কৌম সমাজের মানুষেরা। বহু বছর ধরে এমনটাই হয়ে এসেছে ধারাবাহিকভাবে। তবে দু'-আড়াই দশক ধরে বাংলার মেলার মুখ বদলে যাচ্ছে। প্রকৃত মেলার টান হারিয়ে মেলা তার চরিত্র হারাচ্ছে। আগে মেলা ছিল এলমেলো, ঢিলেঢালা, মেলামেশার অখণ্ড অবকাশ। এক একটি মেলা তিন থেকে সাত-দশ দিন ধরে উদ্‌যাপিত হত নিজস্ব নিয়মে। প্রাথমিকভাবে রাজা বা জমিদারদের তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠলেও এই মেলার দায়িত্ব এসে বর্তায় ভূমিজ বা প্রান্তিক মানুষদের হাতে। এই মেলাগুলোতে স্বাভাবিকভাবেই খুব একটা সাংগঠনিক তৎপরতার প্রকাশ দেখা যেত না। উৎসব, পার্বণ, তিথি বা দিবসকে কেন্দ্র করে এই মেলাগুলো বসত। দশকের পর দশক নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতায় চলে এসেছে সে মেলা।

স্মৃতিজীবী মানুষ দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন। মেলা বলতে যে খণ্ডচিত্র তাঁদের মনের মধ্যে ভেসে ওঠে তা হল— গাঁয়ের মোদকের মিষ্টির আর তেলেভাজার পাশাপাশি দোকান। মিষ্টি বলতে কদমা, বাতাসা আর রসগোল্লা। পাশে মনোহারি জিনিসের বিকিকিনি। ঝুমঝুমি থেকে আলতা, পমেটম থেকে কাঁকুই। হাজা-দাদ-চুলকুনির দাওয়াই বিকোত সেই পশরায়। থাকত মশলা পান, দোক্তা আর বিড়ির দোকান। এসব ছাপিয়ে মেলায় রেকর্ড বিক্রি হত পাঁপড়ভাজা। শাক্ততন্ত্রের পাশাপাশি বৈষ্ণবতন্ত্রের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান থাকত গ্রামের মেলাগুলোতে।

মেলার আসর যেখানে বসত সেখানেই রাতে ঝাঁপ ফেলে দিয়ে তার ভিতর রাত্রিবাস করত বিক্রেতারা। নামী ও অনামী কীর্তনীয়াদের কীর্তনগানে মেলার পরিবেশ ভক্তিময় হয়ে উঠত। কীর্তনের আসর ভেঙে গেলে বেশি রাত করে বসত কবিগান আর তরজাপালার আসর। শ্রোতা আর দর্শকদের মন ভরাতে বসত যাত্রার আসর। হ্যাজাক আর পেট্রোম্যাক্সের আলোতে তিনটে ঘণ্টার শেষে যখন কনসার্ট বেজে উঠত তখন শ্রোতা আর দর্শকদের মধ্যে বয়ে যেত এক নীরব হিল্লোল। জিঙ্ক-অক্সাইড মাখা মুখে মাথায় রিবন বেঁধে বালিকা সখীরা যখন নাচত তখন কৌতূহল আর কৌতুকে আসর টানটান। ভীম তার গদা ছাড়া আর কিছু জানত না। তার অয়েলক্লথ দিয়ে মোড়া গদা, হনুমানের বিশাল লেজ, ন'-ন'খানা কাঠের মুণ্ডুঅলা রাবণ দেখে দর্শক মজে যেত। স্টেজ থেকে বের হয়ে যাবার পথে নায়কের কাঁপানো গলার সঙ্গে সমস্ত শরীরের আন্দোলন দেখে উঠত হাততালির ঝড়। বাংলার মেলার সবচাইতে জনপ্রিয় মাধ্যম ছিল যাত্রাগান। এখন বিদ্যুৎ এসে গিয়েছে। ঝোলানো মাউথপিসের দিকে তাকিয়ে অভিনয়ে সেই রোমহর্ষ আর জাগে না। বিদ্যুতের আলোতে উৎসবের সেই রহস্যটাই এখন উদোম হয়ে গিয়েছে। যাত্রার আসর যে এখনও বসে না তা নয়। এখনও মাইকেল মধুসূদনের মেঘনাদ বধ কাব্য অভিনীত হয়। তবে দেখলে বোঝা যায় সে-বস্তু আসলে মাইকেল বধ কাব্য।

ডুয়ার্সের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জনপদগুলিতেও বিভিন্ন মেলা বসে। তার মধ্যে কোচবিহারে রাসের মেলায়, ময়নাগুড়ি জল্পেশের মেলা, হলদিবাড়ির হুজুর সাহেবের মেলা কিংবা শ্যামাপুজোর সময় হ্যামিলটলগঞ্জের মাঠে যে মেলা বসে সেখানে বেশ কয়েকবার যাবার সৌভাগ্য হয়েছে। মনে হয়েছে কাচের চুরি, জিলিপি, পাঁপড় ভাজা আর নাগরদোলার সেই সহজ সরল আনন্দে ঘুন ধরেছে। অনুভব করতে অসুবিধে হয়নি, গ্রামীণ মেলার ধরন বদলে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। অনেক মেলা তো অবলুপ্তও হয়ে গিয়েছে। আদি উদ্দেশ্য থেকে হুজুগে বিনোদনে বদলে যাওয়াই হয়ত এর কারণ।

মেলা নিয়ে গবেষক ও প্রাবন্ধিক ল্যাডলি মুখোপাধ্যায়ের একটা লেখা পড়ছিলাম। চার দশক ধরে বিভিন্ন গ্রামীণ মেলা নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে তাঁর মনে হয়েছে, মেলাকে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে পাল্টে ফেলা হয়েছে। ব্যবহার করা হয়েছে ব্যক্তিস্বার্থে, রাজনৈতিক কারণে দলতান্ত্রিক উদ্দেশ্যে। সে কারণেই সাধারণ মানুষ, প্রান্তিক কৌম সমাজের মানুষ মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন মেলা থেকে। যে মেলা ছিল লোকসংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বিস্তার, যে

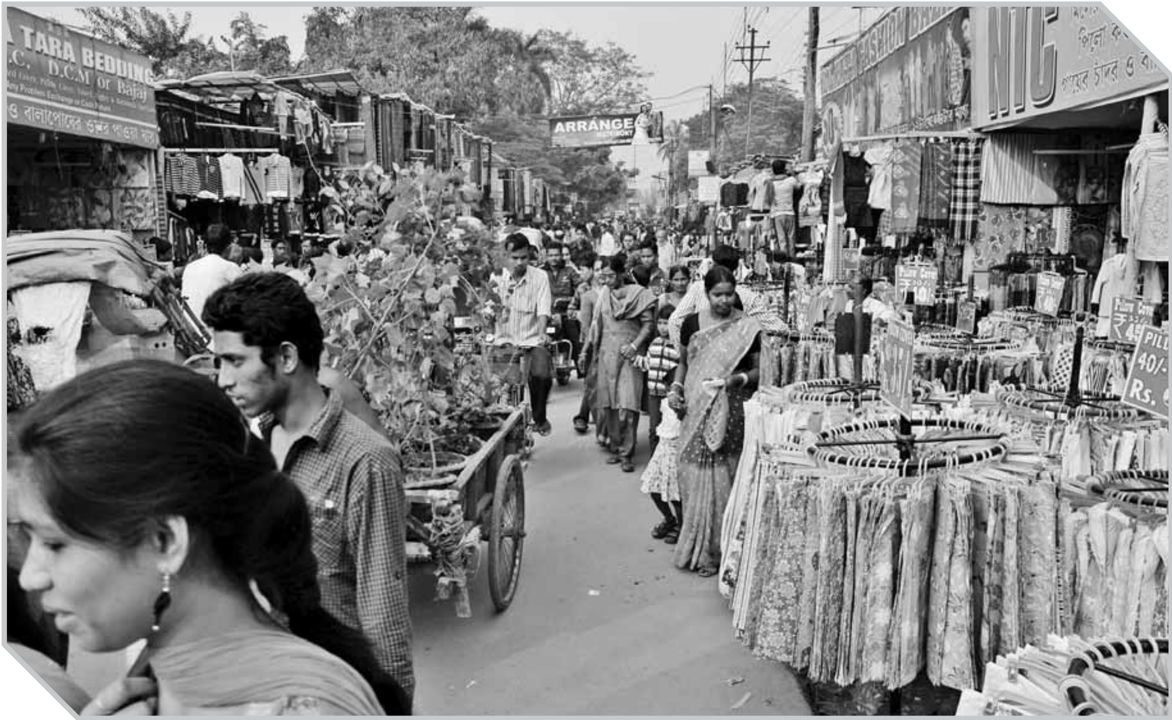

মেলা ছিল দরিদ্র সাধারণ মানুষের যোগাযোগের শ্রীক্ষেত্র, কয়েকটা দিন দৈনন্দিন লড়াই থেকে সামান্য বিরতি, তা আর নেই। গ্রামীণ মানুষের অভ্যাস ও আচার-আচরণে মেলার পরিবেশে থাকত একটা ছন্দ। দৈনন্দিন সাংসারিক কেনাকাটা মেলার অন্যতম দিক হলেও এই মেলাই ছিল গ্রামীণ সাংস্কৃতিক পরিচর্যার মিলনস্থল।

তেলেভাজা, মাটির পুতুল, কাচের চুড়ি, নাগরদোলার সঙ্গে সমবেত মানুষ খুঁজে নিত গানের আসর। লোকসংস্কৃতির নানা অনুষ্ঠান। স্থানের লোকচর্চা অনুযায়ী মেলার চরিত্র বদলাত। একটা গরিব চেহারা ছিল মেলার। চাকচিক্য, মাইকবাজি আর কর্পোরেটে আধুনিকতা মেলার ওপর থাবা বসাতে পারেনি তখনও। মেলা ছিল সস্তা আমোদের জায়গা। কম দামি মণিহারী জিনিসপত্রের সম্ভার নিয়ে উপস্থিত হত ব্যাপারিরা। দলে দলে গ্রাম থেকে গ্রামের মানুষেরা উপস্থিত হত মেলায়। গাছের তলাতেই দশ দিন ধরে চলত রান্নাবান্না, খাওয়াদাওয়া। বাঁধা ধরা নিয়মকানুনের বাইরে কিছু দিনের সময়যাপন। গাছের তলাতেই এই সমস্ত প্রান্তিক সেরে নিত সমাজসংস্থার তর্ক-বিতর্ক। তার চাহিদা, কামনা-বাসনা, ধর্মতত্ত্ব, জীবনযাপনের খুঁটিনাটি নিয়ে কথালাপ সেরে নিত মেলায় এসে। এই মেলাগুলোই ছিল তাদের কাছে এক ধরনের মানসিক শক্তি, মনকে যথেচ্ছ চালন করে মানসিক উন্নতি সাধনের জায়গা। সারা বছরের জন্য এ ছিল এক বিরাট প্রাপ্তি।

কিন্তু রাজনৈতিক নেতারা বুঝতে পেরেছিলেন মেলা হল লোক ধরার কল। অর্থাৎ

> রাজনৈতিক নেতারা বুঝতে পেরেছিলেন মেলা হল লোক ধরার কল। অর্থাৎ যত বেশি লোককে ধরা যাবে বা মোটিভেট করা যাবে তত তার ফল ভোটের বাক্সে ফেরত পাওয়া যাবে। ফলে মেলা কমিটিগুলোর মাধ্যমে গ্রামবাংলার মেলাগুলোর দখল নেওয়া হয়েছিল। মেলা কমিটিই হল দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তারাই ঠিক করবে কে কোথায় অনুষ্ঠান করবে, কে কোথায় জিলিপি ভাজবে...

যত বেশি লোককে ধরা যাবে বা মোটিভেট করা যাবে তত তার ফল ভোটের বাক্সে ফেরত পাওয়া যাবে। ফলে মেলা কমিটিগুলোর মাধ্যমে গ্রামবাংলার মেলাগুলোর দখল নেওয়া হয়েছিল। মেলা কমিটিই হল দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তারাই ঠিক করবে কে কোথায় অনুষ্ঠান করবে, কে কোথায় জিলিপি ভাজবে, কে কোথায় নাগরদোলা টাঙাবে, কে পাবে পার্কিং লটের বরাত। সমস্তটাই ঠিক করবেন রাজনৈতিক নেতারা। মানুষকে ভড়কি দিয়ে চাকচিক্যের মোড়ক পরিয়ে ফাঁকা সংস্কৃতির বোলচালে এককাট্টা করাই হল মূল লক্ষ্য।

অথচ রবীন্দ্রনাথ, গান্ধি থেকে জয়প্রকাশ নারায়ণ সকলেই গ্রামীণ মেলার সংরক্ষণ, পুনর্গঠন ও পুনর্নির্মাণের কথা বলেছেন। মেলায় যে লোকশিক্ষা হয়, লোকায়ত ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চা হয়, মেলার বিকাশ ও বিস্তৃতি যে গ্রামীণ সমাজে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় তা এঁদের কাছ থেকেই জেনেছি আমরা। জানতে পেরেছি কৌম সমাজের ঐতিহ্য বিজড়িত গ্রামীণ মেলাকে তার অবস্থান ও ধারাবাহিকতায় নিরন্তর রক্ষা করে যেতে হবে। তা না হলে সমাজ যাবে, সংস্কৃতি যাবে, ঐতিহ্য নিপাত যাবে।

ইদানিংকার যে কোনও মেলায় গেলে দেখা যায় বিক্রি হচ্ছে মোটরবাইক, টেলিভিশন, মোবাইল। লোকশিক্ষার জন্য প্রান্তিক লোকযাত্রীরা যাত্রা দেখত, বাউল ফকিরের গান শুনত, কথকতা আর কীর্তনের আসরে ভিড় জমাত তারা আজ ব্রাত্য হয়ে পড়েছে। গ্রামীণ কারিগররা মেলা থেকে সরে যাচ্ছে। দখল নিয়েছে চাইনিজ পণ্যজাহাজ। তেলেভাজা-খুরমা বদলে গিয়ে চাউমিন-বিরিয়ানির গ্রামীণ 'ভেরিয়েশন'। শহুরে আমুদে মধ্যবিত্ত বাউল ফকিরের মেলায় গিয়ে গাঁজায় আগুন দিয়ে নীল আকাশ ঢেকে দিচ্ছে। মাঝখান থেকে পকেট ভরছে ফেরেববাজের। এর মধ্যে কিঞ্চিৎ চোখের আরাম দেয় নাগরদোলা। মেলাতে বহুদিন ধরেই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে নাগরদোলা। কে যে এমন নাম রেখেছিলেন জানা নেই তবে গ্রামের মধ্যে এখনও নাগর-নাগরীর দোল দেখতে পাওয়া যায়। বোঝা যায় রাই-কানুর দোললীলা এখনও মূর্তি ধারণ করে।

শালবনে রক্তের দাগ

সুবোধবাবু দেহ রেল লাইনের পাওয়া যায়। সুইসাইড নোট সমেত। নিখিল, সুবোধরা চলে যাবে— এটাই নিয়ম। জঙ্গলে এখন বেশ কড়াকড়ি চলছে। বাঘ হল এমন জীব যার পুরোটাই বিক্রি হয়। তারপর এল সবুজ গাছের মত মেয়ে। নাম মায়া। জীবনের বাঁকে বাঁকে আসা নারীগুলি কি চারপাশ দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে? আমি যেন এক ক্লান্ত ধূসর পথ দিয়ে যাই। রাতে বিছানায় পড়ে থাকতে দেখি রক্তাক্ত নারী দেহ। কে সে? মায়া? দরজায় টোকা দিয়ে কে জানি বলছে, 'আমি মায়ার ভাই।' —**সাগরিকা রায়ের** থ্রিলার।

২৪

দরজার বাইরে কে? কে ডাকছে আমাকে? নিখিল? বিছানায় শুয়ে আছে নিখিলের দিদি মায়া! এ কী করে সম্ভব! মায়া এখানে কেমন করে আসবে? মাথা টলমল করছে। ঘর ছেড়ে বাইরে যেতে ভয় পাচ্ছি। আবার ঘরে যে থাকবো, ঘরে থাকতেও ভয়! অমন ভাবে রক্ত মেখে কেন শুয়ে আছে মায়া? রাঘব কি মেরে রেখে গেছে মায়াকে? মেরে আমার বিছানায় শুইয়ে রেখেছে! আমাকে ফাঁসাতে চায় কে? আরে, আরে, আলোর সুইচটা কোনদিকে?

আলোর সুইচে আঙুল রাখতেই আলো জ্বলে উঠল। খাটের দিকে সভয়ে তাকালাম। পরিপাটি বিছানা। কোথাও মায়ার চিহ্ন মাত্র নেই! বাইরে কে ছিল? কেউ না নিশ্চয়! সব আমার চোখের ভুল! মন ভুল দেখাচ্ছে। চোখ ভুল দেখছে! ব্যালকনির আলোগুলো জ্বেলে দিলাম। পুরো বাড়ি ঝলমল করছে। তুই কোথায় পালাবি নিখিল? আমার হাত থেকে পালানো ইজ নট পসিবল! কাম অন। সামনে আয়! ছুটোছুটি করতে থাকি আমি। বাড়িটা আলোর বান ডেকে আমার ছুটোছুটি দেখতে থাকে। ব্যালকনির চারপাশ ছুটে ছুটে মরি। বাড়ির আনাচে কানাচে দৌড়ে বেড়াই। কোথাও একটা জনমানুষ নেই। কাউকে না পেয়ে একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। ব্যালকনির কৌচে শুয়ে পড়লাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লাম। একটা একটা করে আলো নিভে যাচ্ছিল। আলো কমে আসছে যেন। কেউ নিভিয়ে দিচ্ছে কি আলোগুলো? অজস্র ছায়া ছায়া আলো কাঁপতে কাঁপতে নিভে যেতে থাকে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাই!

ঘুম ভাঙল বেলার দিকে। সারারাত বাইরে শুয়েছি। বৃষ্টির জলো হাওয়ায় শরীর ভার ভার ঠেকছে। উঠতে ইচ্ছে করছে না। আজ মঙ্গলবার। আমার দুটো ইম্পরট্যান্ট ক্লাস রয়েছে। যেতে পারব কি? না, না, যেতে হবে। ঘরে বসে কাটুম কুটুম সময় কাটানো ভারি খারাপ। গরম জলে স্নান করে নেব। উঠে বসলাম। এ কী? আলোগুলো জ্বলছে কেন! সারা রাত আলো জ্বলেছে নাকি? আমার যেন মনে হয়েছিল আলো নিভিয়ে দিচ্ছে কেউ! কে আলো নিভিয়ে দেবে? এ বাড়িতে একা আমি! কেউ নেই আর! যাকগে, নেশার ঘোরে ভুল দেখেছি!

গিজার অন করে গরম জলে স্নান করে নিলাম। আমার বড্ড স্নানের বাতিক। আগেকার দিনের পিসি-মাসির মত। শুচিবায়ু নাকি? হা হা হা! হরদম মনে হয় গায়ে নোংরা লেগে আছে!

ক্লাস নিয়ে সোজা আমার গয়েরকাটার বাড়িতে। এবারে ঘন ঘন দুবার এলাম। তখন মায়া ছিল সঙ্গে। এবারে মোহ। হা হা হা! কাজের বউটাকে খবর দিতে হবে। কাল এসে বাড়ি সাফ সুতরো করে রান্নাবান্না করে গুছিয়ে দিক। দিন চারেক থাকব এখানে। ফোন করে শিপ্রাকে খবর দিলাম। কাল এসে কাজকর্ম করে যাবে। এখন কলেজের উদ্দেশে বেরিয়ে যাব।

এই বাড়িতে এলে ইদানিং সেই দিনের কথা মনে পড়ে যায়। এই যে চেয়ারটা চুপচাপ এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে, এটার ওপর দাঁড়িয়ে নিজেকে নিজের গলায় ফাঁস পরিয়ে দিতে হচ্ছিল অনির্বান বসুর জুলুমবাজিতে। আমাকে সেদিন মরতেই হত। চেয়ারটা মৃত্যুর কথা মনে করিয়ে দেয়। বারবার। আজকাল অন্ধকারে খুব ভয় হয় আমার। এই একটু আগেই মনে হল ঘরের ভেতরে কেউ ছিল। ঠিক ছিল কেউ। আমি যেন দেখলাম আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে সে। আলো জ্বালতেই কোথায় কী? কিচ্ছু তো নেই কোথাও! কেন এমন মনে হয়! আমার

স্নায়ু দুর্বল হয়ে পড়ছে কি? মানসিক রেস্টের দরকার আছে কি? জানি না। আমি যথেষ্ট শক্ত মনের মানুষ। জীবন আমাকে কম অভিজ্ঞতা দেয়নি! তাহলে এমনটা কেন হচ্ছে? কেউ কি আমাকে ভয় দেখাতে চায়? কে সে?

আর এই বুকসেলফ! আস্তে চাপ দিতেই সেলফটার একটা পাশ আলগা হয়ে গেল। আলগা হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে এল। সামনে বই সাজিয়ে রাখা র‍্যাক। পেছনে দুটো মানুষ লুকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার মত জায়গা। এইখানে মেয়েটাকে ঢুকিয়ে রেখেছিলাম। এখান থেকে মেয়ে গেল কী করে? বের হল কেমন করে? হুম, সোজা রাস্তা হল সেলফ ঠেলে সরিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। সেলফটা ফের যথাস্থানে রাখতেই নজরে এল ডিভিডিটা। এটা কার? এখানে এল কী করে! না, আমার তো নয়। কখনওই দেখিনি আগে! কিছুদিন আগে যখন মায়াকে নিয়ে এসেছিলাম, তখন কি ছিল এটা? না, না, তখন আমি সেলফটা মোটেই সরাইনি। মায়ার সামনে গুপ্ত ব্যাপারটা দেখাব না বলে এদিকটা পুরো এড়িয়ে গিয়েছি। তাহলে কি সেই দিনই মেয়েটা এটা রেখে গিয়েছিল? সোজাসুজি চিন্তা করে দেখলে মেয়েটার কথা ভাবাই ভাল। সেকেন্ড অপশন নেই। জটিল করে ভাবতে হলে ঝামেলা বেশি হয়। মেয়েটা রেখেছে সিওর। কিন্তু, কেন রেখেছে? ভুল করে? কী আছে এতে?

প্রোজেক্টারে দেখতে হবে। তাহলে আলিপুরদুয়ারে গিয়ে দেখতে হবে। এখানে প্রোজেক্টারের ব্যবস্থা নেই। মন খিচ খিচ করছে। হঠাৎ করে একটা ডিভিডি প্লেয়ার কেন এখানে? আমাকে দেখাতে চেয়ে কেউ রেখে গেছে?

সত্যম বা রুক্মিণী গিয়েছে লাস্ট উইকেন্ডে। মানে আট দিন হল ওরা গেছে। কিন্তু আর যোগাযোগ করেনি। কোন ধান্ধায় আছে বাপ-বেটি কে জানে! আচ্ছা, ওরা বাপ-বেটি নয় এই প্রমাণ আমার জানা। তাহলে কেনই বা বাপ-বেটি বলছি? অভ্যেস আর কি! কথা হল, ওরা কোনও একটা বিষয়ে ব্যস্ত আছে বলে যোগাযোগ করছে না! সেই বিষয়টা কী এটা জানা আমার পক্ষে সম্ভব যদি শ্যামলকে হাতে পাই। শ্যামল জেলে আছে। ওকে জামিনে ছাড়াতে যাব। ক'টাদিন হাজতের চেহারাটা দেখিয়ে রাখলাম। দ্বিতীয়বার বেগরবাই করতে ভয় পাবে! টাকার লোভেই কি সত্যমের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল শ্যামল? আমার থেকে কম পেয়েছে কিছু? আমারই বাড়িতে অস্ত্রভাণ্ডার গড়ে তুলেছিল সত্যম কার সাহায্য নিয়ে? নিমকহারামদের আমি সহ্য করতে পারি না। এবারে শ্যামলকে আমার চাই। জামিনে ছাড়িয়ে নেব। তারপর ওকে দিয়ে সত্যমের স্বরূপ জেনে নেব।

কাল সন্ধ্যের দিকে বেরিয়ে পড়ব ভাবছি। ডিভিডির ব্যাপারে মন পড়ে আছে। মন বলছে ডিভিডিতে এমন কিছু আছে, যেটা আমার জানা দরকার। যা আমার জন্যই তৈরি।

আমার জন্যই তৈরি মানে? কী বলছি আমি! একটা ডিভিডি প্লেয়ার আমার জন্য কে বানিয়ে আমাকেই প্রেজেন্ট করবে? কিন্তু, অজান্তেই কথাটা মনে এসে গেছে। অবচেতন মন কিছু একটা ইঙ্গিত পেয়েছে। তাই সচেতন মন সেই বার্তা জানিয়ে দিল।

ডিভিডি দেখব আলিপুরদুয়ারে গিয়ে। হয়তো কিছুই না। ছ্যাবলামো সিনেমার ডিভিডি। হয়তো...???

বাইরে কেউ ডাকছিল। আই হোল দিয়ে দেখে নিলাম ফের কেউ ফিনাইল বেচতে এসেছে কিনা। না, এই ভদ্রলোকটিকে চিনি। আমার বাড়ির পাশে এক ফালি মাঠ আছে। মাঠের পরের বাড়ির মালিক শোভনবাবু দরজায় দাঁড়িয়ে। দরজা খুলে দাঁড়ালাম —আসুন আসুন।

আমি তাদের জন্য রেস্তরাঁ খুলব, যাদের প্রাইভেসি দরকার হয়। আলাদা রুম থাকবে রেস্তরাঁর আড়ালে। ইচ্ছে করলে যদ্দিন খুশি, না হলে দু'-চার ঘণ্টা আরামসে কাটিয়ে যেতে পারবে বিজনেস পার্টনারের সঙ্গে। সে হোক এজেন্সির বিজনেস। পার্টনার হবে টুসটুসে পাকা আমের মত। দু' ঘণ্টা পরে বের হবে যখন, তখন আর রস নেই। ঘরে ঢুকেছিল আম, বেরিয়ে এল আঁটি।

কী ব্যাপার? পথ ভুলে মনে হচ্ছে।

শোভনবাবু সৌজন্য সূচক হাসি মুখে রাখলেন —এই আর কি! আচ্ছা, কিছু মনে করবেন না, আপনি কি আজ এসেছেন?

অবাক হওয়ার মতই প্রশ্ন। মুখে বললাম —হ্যাঁ, আজ এসেছি। কেন বলুন তো? কোনও কি প্রয়োজন আছে ?

—না, মানে, যে মেয়েটি এখানে থাকে, সে বলছিল যদি আপনার সঙ্গে দেখা হয় বলে দিতে, বেশি করে ফিনাইল রেখে গেলাম। উনি শুধু শুধু কিনবেন কেন! ফোনে পাচ্ছি না বলে বলতে পারলাম না। বুক সেলফের র‍্যাকে আছে। আচ্ছা, মেয়েটি কে? আপনার মেয়ে?

আমি হতবাক। আমার বাড়িতে মেয়ে মানে? কোন মেয়ে এখানে থাকে? তাকে কেমন দেখতে?

—মানে? আপনি জানেন না যে আপনার বাড়িতে একটি মেয়ে থাকে? সে আপনার ঘনিষ্ঠ রিলেটিভ! নিজে বলল আমাকে! বলছেন কী? খুব সুন্দরী, শিক্ষিতা। সে আপনার কেউ নয়? বলছেন কী? আমার মাথা ঘুরছে।

—যাবেন না। বলে যান, তাকে দেখতে কেমন? খুব ফর্সা? লম্বাটে মুখ?

—ঠিক বলেছেন। আপনি ওকে চেনেন তাহলে! কিন্তু এখানে থাকত সেটা আপনাকে জানায়নি? অদ্ভুত কথা! সে তাহলে আপনার আত্মীয় নয়? কী হচ্ছে চারপাশে বলুন তো!

২৫

বলাবাহুল্য যথেষ্ট চিন্তার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। আমার বাড়িতে নিশ্চিন্তে কাটিয়ে চলে গেল একজন! আমার সম্পূর্ণ অজান্তে! সেই মেয়েটাই ছিল! আমাকে ল্যাজে খেলাচ্ছে! ওই হেলে সাপের ল্যাজ খসিয়ে দেব আমি। কোথায় দাঁড় টানতে এসেছ, জান না কার্তিক! সুন্দর মুখের খুব দাম মার্কেটে, তা জান কি? কব্বে পাচার করে দেব, বুঝতে বুঝতেই দেখবে লাহোরের পানশালায় স্বল্প পোশাকে নাচতে নেমেছ! আসলে কী বলতো? রিভেঞ্জ আমার রক্তে। আমার পথের কাঁটাকে মাত্র কিছুক্ষণ লাগে সরিয়ে দিতে। আপাত ভদ্রলোকের আড়ালের মানুষটা আমি যে ঠিক কী, সেটা আমিও ভাবতে বসলে একটা দিন পুরো লেগে যাবে হে তিলোত্তমা!

সারা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়ালাম। যদি কিছু রেখে গিয়ে থাকে, যা আমার পক্ষে ভাল নয়, ক্ষতিকর, তাহলে সেটা আমারই আগে জানা দরকার। খোঁজাখুঁজি সেরে আপাতত মিউজিক সিস্টেমে গান শুনছি। ক্লাসিকাল আমার বড্ড ফেভারিট। শুভা মুদগল শুনছি। ভাবছি, অনেক হল। এবারে গুছিয়ে বসতে হবে। সত্যমের মতো একটা রেস্তরাঁর বিজনেস করব। হাইফাই রেস্তরাঁ। খুব সাধারণ মানেরটা আমার আবার ধাতে সহ্য হবে না। পাঁচটা লোক এসে চপ, কাটলেট খাবে, হাই হাই চেঁচামেচি ...ধুত! আমি তাদের জন্য রেস্তরাঁ খুলব, যাদের প্রাইভেসি দরকার হয়। আলাদা রুম থাকবে রেস্তরাঁর আড়ালে। ইচ্ছে করলে যদ্দিন খুশি, না হলে দু'-চার ঘণ্টা আরামসে কাটিয়ে যেতে পারবে বিজনেস পার্টনারের সঙ্গে। সে হোক এজেন্সির বিজনেস। পার্টনার হবে টুসটুসে পাকা আমের মত। দু' ঘণ্টা পরে বের হবে যখন, তখন আর রস নেই। ঘরে ঢুকেছিল আম, বেরিয়ে এল আঁটি। ক্লান্তি ঢাকতে ডিপ করে ব্লাশার লাগায়। নাইট গ্লাস পরে নেয়। এদিকে আম খেয়ে তৃপ্ত পার্টনার মুক্ত হস্তে দাম মিটিয়ে বিদায় নেয়। এই বিজনেসে টাকা আছে। মজা আছে। তৃপ্তি আছে। এই মেয়েকে সেই বিজনেসের গোলাপখাস আম বানিয়ে রাখব। তাবড় তাবড় নেতাদের মৌজ-মস্তির জন্য এই মেয়ে থাকবে।

বাড়িতে ডাবল তালা লাগিয়ে দিলাম। শোভনবাবুকে জানিয়ে রাখলাম, সেই মেয়ে বা অন্য কেউ এসে বাড়িতে ঢুকলে একটিমাত্র

ফোন করবেন। আর কিছু চাই না।

ইদানিং নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করি। নতুন ড্রাইভার রাখিনি। শ্যামলকেও আর রাখব কি না ঠিক নেই। বেরিয়ে পড়েছি। আমার মনে হচ্ছে থানায় একটা এফআইআর করে যাই। কিন্তু, এতে করে আমাকে প্রচুর প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। কেন আমার বাড়িতে মানে ঘুরিয়ে আমাকেই প্রশ্ন করা যে তোমার ক্ষেত্রেই বা এমন হচ্ছে কেন? এতসব জবাব দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। সমস্যা চিরকাল আমাকেই বইতে হয়েছে, আমিই সামলে নেব। সেই কবে বাবা-মা স্বর্গে চলে গেছে। আপনজন বলতে আমি ছাড়া আমার কেউ নেই। সত্যি বলতে চাইও না। বন্ধু? ওরে বাবা! শব্দটাই ভয় সৃষ্টি করে! কবে যে বন্ধু বন্দুক হয়ে যায়, তার কোনও ঠিক নেই! শোভনের ফোন নম্বরটা নিয়ে রেখেছি।

বৃষ্টি নামল রাস্তায়। তখন একত্রিশ নং জাতীয় সড়কে চলছে গাড়ি। এমন মুষলধারে বৃষ্টিটা নামল, ওয়াইপার চলছে তবুও কাচ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে! রাস্তার একধারে গাড়ি রাখলাম। আধ ঘণ্টা ম্যাক্সিমাম অপেক্ষা করি। বৃষ্টি থামলে ফের রওনা হব। গাড়িতে বসে বসে বৃষ্টির অঝোর রূপ দেখছি। বাইরে থেকে কেউ উইন্ডোস্ক্রিনে টোকা দিচ্ছে। কে? লিফট চায় নাকি? এই দুর্যোগের মধ্যে একা আমি... জানালা খুলে দেওয়া ঠিক হবে?

জানালা খুলে না দেওয়ায় সে চলে যাচ্ছে। একজন মহিলা কি? বুঝতে বুঝতে বর্ষার আড়ালে চলে গেল মানুষটা। কে এসে ছিল? কী বলতে চেয়েছিল?

পনের মিনিটের মধ্যে বৃষ্টি ধরে গেল। একটু কমে আসতে গাড়ি স্টার্ট দিলাম। ভেজা রাস্তা। চাকা স্কিড করতে পারে। এখন বৃষ্টির পরে রাস্তার দুপাশের সবুজ আরও সবুজ হয়ে উঠেছে। সেই ডুয়ার্স নেই যদিও, তাহলেও ডুয়ার্সের একটা মন মাতানো গন্ধ আছে। এই পৃথিবী গ্রহের কোথাও গিয়ে থাকতে পারি না। অথচ সরল, তাজা মেয়েটাকে আমিই নষ্ট করে দিতে সাহায্য করছি! কী অদ্ভুত কম্বিনেশন আমার চরিত্রে। হা হা হা... হায় ইয়ে মায়া...আ ...আ!

আলিপুরদুয়ারে ঢুকতেই নিখিলের বাবার সঙ্গে দেখা। লোকটা আমার বাড়ির দিক থেকে আসছে। বোধহয় ওখানে গিয়ে পায়নি বলে এগিয়ে এসে দেখছিল আমি আসছি কি না। বা... জানিনা কেন আসছে! গাড়ি থামিয়ে মুখ বাড়ালাম —কী হল? আপনি এখানে?

হতভম্ব লোকটা গুছিয়ে কথা বলতে পারছিল না। মোটামুটি বোঝা গেল সে ছেলে বা মেয়ের কারওই খোঁজ পাচ্ছে না বলে চিন্তিত। গ্রামের দু'-চারজন ভয় দেখিয়েছে মেয়ে কোথায় গেল খোঁজ নাও। জামাই ভাল লোক কিনা... এলও না এত দিনে একবার! কোনও ফোন নেই! ছেলেটাও নিপাত্তা। বড্ড ভয় ধরেছে বাপের প্রাণে... ইত্যাদি।

—তুমি এখানে এসেছ বাড়ির লোক জানে? তোমার বউ? গ্রামের লোক?

—না বাবু। আমি ছুপ করি চইলে আসিছু। কেউ জানলে আবার নানান কথা জানতে চাইবে বলে আপনার থেকে জেনে বাড়ি যাব। সত্যিটা জেনে তারপরে সকলকে জানাব।

যাক। লোকটা সত্যি বলছে মনে হয়। এখন এটাকে নিয়ে করি কী! বাড়িতে নিয়ে যাই।

গাড়ি থেকে নামালাম লোকটাকে। কিছু খাবার দিলাম —খেতে থাক। তোমার ছেলে মেয়ের সঙ্গে কথা বলিয়ে দিচ্ছি। বলে আমার গুপ্ত রুমে ঢুকে পড়লাম। ভবিষ্যতে লাগতে পারে বলে কতকিছু রেডি রাখতে হয়। মোবাইলে টেপ করা ছেলে-মেয়ের কথা আছে। মোবাইলটা বের করে লুকিয়ে আমার ল্যান্ড ফোনের পেছনে

> এখন বৃষ্টির পরে রাস্তার দুপাশের সবুজ আরও সবুজ হয়ে উঠেছে। সেই ডুয়ার্স নেই যদিও, তাহলেও ডুয়ার্সের একটা মন মাতানো গন্ধ আছে। এই পৃথিবী গ্রহের কোথাও গিয়ে থাকতে পারি না। অথচ সরল, তাজা মেয়েটাকে আমিই নষ্ট করে দিতে সাহায্য করছি! কী অদ্ভুত কম্বিনেশন আমার চরিত্রে। হা হা হা... হায় ইয়ে মায়া... আ ...আ!

লুকিয়ে রাখলাম। রেকর্ড করা আছে লোকটার সন্তানদের গলা। শুনে যাক বাপ।

ফোন করলাম। টেপ অন করে দিলাম। লোকটা —হেই নিখেল? বলতে বলতেই নিখিলের গলা —বাপ, মুই ভাল আছু। চিন্তা করো না। আমি পরে আসব। টাকা নিয়ে আসব। কয়দিন পরে আমার স্যারের কাছে টাকা পাঠিয়ে দেব। আচ্ছা, রাখি বাবা।

লোকটা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। জানে না পরলোকের ওপার থেকে কথা বলেছে ছেলে। এবারে মায়ার গলাটা টেপ ঘুরিয়ে জায়গা মতো আনলাম। ফোন ডেড সেটা বোঝে না লোকটা। আমি ফোন ধরে লোকটার হাতে দিতে আলতো হাতে টেপ অন করে দিলাম। মায়া খুব হাসছে —মুই ভালা আছু রে মা-বাপ। তোরা ভালা তো রে? পাট, লাফা শাক খাছু? এখুন বাড়িত যাব না। দেরি হবে। মোর ছঙ্গার হইছে। দেকাশুনা নাগে। বর ভালা নোক। সোহাগ করে খুব।

মায়ার গলা থেমে গেল। লোকটা হাসছে। খুশিতে চোখে জল এল। ওর হাতে হাজার দুই টাকা দিলাম। নিখিল টাকা পাঠালে ফের দেব। আসতে হবে আগামী মাসের শেষ সোমবার। তবে, কাউকে জানাতে পারবে না। লোকে টাকার গন্ধ পেলে কেড়ে নেবে। ঘরে চোর ঢুকে যাবে।

লোকটা টাকা নিয়ে চলে গেল। সামনের মাসে বউকে অবধি না জানিয়ে আসবে। মেয়েছেলের পেট পাতলা। বলে দেবে কাউকে। তারপরে চোর ডাকাত সব জেনে যাক আর কি?

চলে গেল লোকটা। ভাগ্যিস নিখিল আর মায়াকে দিয়ে এই কথাগুলো রেকর্ড করে রেখেছিলাম। মায়া বর বলতে আমাকে বুঝেছিল। খুশির হাসিতে সোহাগ কথাটা বলে ফেলেছিল। তবে... লোকটা মানে নিখিল —মায়ার বাপটা বিপজ্জনক হতে পারে আমার জন্য। ওই যে যাচ্ছে লোকটা! আজ বাড়িতে গিয়ে গপ্পো করবে ঠেসে। কিন্তু একদিন সত্যি জানতে পারবে যখন! আমি কি ভুল পদক্ষেপ নিচ্ছি? জবাবদিহি শেষে আমাকেই করতে হবে নাতো?

২৬

রাতের অপেক্ষা করছি। জানালায় দাঁড়িয়ে দেখছি আস্তে আস্তে সন্ধের আঁধার নেমে আসছে ডুয়ার্সের ওপরে। যেন হালকা ছাই রঙা চাদরে গা ঢেকে নিল ডুয়ার্স। আজ নিখিলের বাবা আসার পর থেকেই মন প্রস্তুতি নিচ্ছে একটা বড় কাজের। কথায় বলে, না রহেগা বাঁশ, না বাজেগি বাঁশরি! বাঁশ কীভাবে অদৃশ্য হতে পারে? বাঁশের অদৃশ্য হওয়াই একমাত্র সুবিধে নয়। বাঁশকে অদৃশ্য করলেই সব সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। কোথাও কোন খুঁত রাখা চলবে না। নিজের প্ল্যান দ্বিতীয়জনের কাছে প্রকাশ করা চলবে না। বিশ্বাস করি না বলেই রুক্মিণী পর্যন্ত আমার সঙ্গে লেপটে থেকেও কিছুই জানে না। জানতে দেওয়ারই বা দরকার কী?

এখন এই লোকটা গ্রামে ফিরে যাচ্ছে। ভাল কথা। গ্রামে গেলেই গ্রামের লোকেরা আসবে। সারাদিন কুথায় ছিলে? লোকটা খুশি মোটেই লুকোতে পারবে না। অনেকদিন পরে তার ছেলে-মেয়ের সঙ্গে কথা হয়েছে। ছেলে কত খুশি। মেয়ে সোহাগে গরবিনী। হ্যান ত্যান নানা কথা বলতে বলতে চলে আসবে টাকার কথা। লোকটা ভুলে যাবে চোর ডাকাতের ভয়। হুড়মুড় করে বলে বসবে ছেলের টাকা পাঠানোর কথা। এখানেই সমস্যা। টাকা মানেই আমার প্রসঙ্গ আসবে। আমি জড়াতে চাই না হে নিখিলের বাপ। তুমি এই বারে চুপ কর। নাকি আমাকেই চুপ করাতে হবে? সেই কথা উঁকি ঝুঁকি মারছে মনের কোণে। লোকটা বিপজ্জনক। বড় বড় ব্যাপার সামলে এসে কি পচা শামুকে পা কাটবে আমার?

নিশ্চিন্তে চিন্তা করার উপযুক্ত সময় হল রাত। রাতের ঘন কালো রূপ অন্ধকার দুনিয়াকে চিনতে সাহায্য করে। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ!

কে আসছে এই রাতে? আমার চারপাশে শত্রু লেগেছে। সটান দাঁড়িয়ে পড়ে পিস্তলটা বের করে হাতে নিই। দরজায় কার ছায়া নড়ে। ভারি গলায় হাঁক পাড়লাম —কে ওখানে?

ছায়া স্থির। আমি একটু থমকে গেলাম —কে? কে তুমি? সামনে এস বলছি!

ছায়া নড়ে উঠল। এগিয়ে আসছে দরজার দিকে। দরজায় টোকা পড়ল— টক! টক!

দরজা খুলতে হবে। যে এসেছে, তার কাছে আর্মস নেই, একথা ভাবা ঠিক না। অথচ কিছু করার নেই! যে এসেছে সে দেখা করতেই এসেছে। আমাকে মেরে রেখে যাবে কি?

দরজায় টোকা পড়ে যাচ্ছে— টক! টক!

এক মুহূর্ত না ভেবে ঝট করে দরজা খুলে ফেললাম। বারান্দার স্মোকি লাইটে একজনকে দেখা যাচ্ছে। মুখ আলোর বিপরীতে। নিশ্চুপ।

—কে? কে আপনি? আমি রেগে যাচ্ছিলাম।

—আমি শ্যামল।

—শ্যামল? তুমি জামিন পেয়ে গেছ?

—হ্যাঁ। আপনি ব্যবস্থা করেছিলেন। সব হয়ে গেছে ঠিকঠাক।

—কি আশ্চর্য! একটা ফোন করবে তো! এস, ভেতরে এস।

—একটা কথা জানতে এসেছি। আমাকে জেলে পাঠালেন কেন?

—আমি তোমাকে জেলে পাঠাইনি শ্যামল। তুমি সত্যমের সঙ্গে সোনা পাচার করতে গিয়ে ধরা পড়ে জেলে গিয়েছ। আমি তোমাকে জামিনে ছাড়িয়েছি। সত্যম নিজের মুক্তির জন্য রুক্মিণী আর তোমাকে ইউজ করেছে।

—ওই গাড়িতে সোনা যাচ্ছে, এটা আপনিই পুলিশকে জানিয়েছিলেন।

—আমি জানাইনি। আর শোন, যদি জানাতামও, তোমাকে কৈফিয়ত দিতাম না। তুমি আমার টাকায় খেয়ে, আমাকে লুকিয়ে সত্যমের সঙ্গে হাত মিলিয়েছ, একথা কি জানিয়েছিলে আমাকে? কী শ্যামল? রাতে একই ঘরে তোমরা দুজনে বসে চা পান করেছ সেটাও কি আমাকে বলে করেছিলে? কে সত্যম? সে তোমাকে কী দিয়ে কিনে নিয়েছিল? এখন জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এসেছ আমাকে ধমকাতে?

—তাহলে এবারে বলুন, অস্ত্রগুলো কোথায় গেল? শ্যামলের গলায় প্রচ্ছন্ন হুমকি অনুভব করলাম।

—অস্ত্র?

—জানেন আপনি। বলুন, কোথায় সেই অস্ত্র?

—তোমাকে কে পাঠিয়েছে আমাকে অপরাধী সাব্যস্ত করতে? সত্যম? তাহলে যাও, তোমার ডনকে বল এই প্রশ্নের জবাব দিতে। কোথায় তোমার অস্ত্র? কে দিয়েছে তোমাকে অস্ত্র?

—কিছু না জানার ভান করছেন? আমি জানি, আপনার মত অমানুষ খুব কম আছে। অস্ত্রর গুপ্ত খবর আপনি জানতেন। নিখিলের মতো হয়ত আমাকে মেরে ফেলবেন, কিন্তু আপনার অপরাধ চাপা থাকবে না। মনে রাখবেন। অস্ত্র সত্যমজির। আপনি সেই অস্ত্র হাপিস করেছেন। টাকা কামিয়েছেন। হাফ টাকা আমাকে দিতে হবে। তাহলে আমি সব ভুলে যাব। সত্যমকেও চিনব না। বলুন, রাজি? শ্যামলের গলায় সাপের মত হিস হিস শব্দ। আমি বুঝতে পারছি পাইথনটা আমাকে পাঁকে পাঁকে জড়িয়ে ধরেছে।

—বুঝেছি। তোমার টাকা চাই। তা, সে যে কোনও উপায়েই হোক। সেই জন্য আমাকে ভয় দেখাতে এসেছ! কিন্তু তুমি জান না শ্যামল, সত্যম তোমাকে কতটা ঠকাচ্ছে! আমি তোমাদের

❛নিখিলের মতো হয়ত আমাকে মেরে ফেলবেন, কিন্তু আপনার অপরাধ চাপা থাকবে না। মনে রাখবেন। অস্ত্র সত্যমজির। আপনি সেই অস্ত্র হাপিস করেছেন। টাকা কামিয়েছেন। হাফ টাকা আমাকে দিতে হবে। তাহলে আমি সব ভুলে যাব। সত্যমকেও চিনব না। বলুন, রাজি? শ্যামলের গলায় সাপের মত হিস হিস শব্দ। আমি বুঝতে পারছি পাইথনটা আমাকে পাঁকে পাঁকে জড়িয়ে ধরেছে।❜

সত্যমজির অস্ত্র সম্পর্কে কিছু জানি না। তোমাকে আমার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিচ্ছে সত্যম। ও নিজে অস্ত্র পাচার করে তোমার ভাগ থেকে তোমাকে বঞ্চিত করে উলটে আমার নামে দোষ দিচ্ছে। তুমি এই সহজ কথাটা বুঝতে পারছ না?

—এই বাড়ির পুকুরে ডুবিয়ে রাখা ছিল সত্যমজির প্রচুর অস্ত্র। সেটা নেই। আপনি ছাড়া কেউ নেই এখন বাড়িতে। একমাত্র আপনিই পারেন সেই অস্ত্র সরিয়ে দিতে।

—ফের সেই ভুল। আমার বাড়ির পুকুরে অস্ত্র লুকোনো ছিল? সেই কাজটা তুমি আর সত্যম মিলে করেছিলে? বাঃ! তারপর আঙুল তুলছো আমারই দিকে? আমি গয়েরকাটা থেকে জাস্ট ফিরেছি। বেশ ক'টাদিন ওখানে ছিলাম। ফাঁকা বাড়ি পেয়ে কে বা কারা এসে মাল সরিয়েছে, সেই খোঁজ নাও! তোমার জামিনের ব্যবস্থাটা আমিই করেছিলাম, বুঝেছ? সত্যম না! এসব শুনতে ভাল লাগছে না। তুমি যাও। আমি এখন রেস্ট নিচ্ছিলাম।

—আপনার কথা বিশ্বাস করব কেন?

—করো না। তুমি তিনি কোটি টাকার সোনা নিয়ে কোথায় যাচ্ছিলে আমাকে বলনি, আমি কিন্তু সেই কারণে তোমাকে ত্যাগ করিনি। যেটা সত্যম করেছে। করে পালিয়েছে। তোমার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে পালাল কে? ওই সোনার ভাগ কি তোমাকে দেবে?

শ্যামল মুখ গোঁজ করে ভাবছে। মানে দোলাচলে আছে। আমি রাগত স্বরে কথা বলছি —এবারে যাও। খাবার খেয়েছ? আমার খাবার থেকে কিছুটা নিয়ে যাও। তারপরে শুয়ে শুয়ে ভাব, কী করে আমাকে প্যাঁচে ফেলবে!

শ্যামল এগিয়ে এল। একটা খাবারের প্যাকেট ধরিয়ে দিলাম ওর হাতে। চলে যাচ্ছে। একবার পেছন ফিরে তাকাল। আমি হাত নাড়লাম —গুড নাইট।

খোলা জানালার সামনে সরাসরি দাঁড়াতে নেই! বিশেষ করে আমার মতো মানুষের। যাদের দিকে ওয়ান শটার তাগ করা আছে! তবু সাইড করেই দাঁড়ালাম। শ্যামলকে কেউ উসকানি দিচ্ছে। বা দিয়ে গেছে যাওয়ার সময়। মিষ্টি করে কাঁদুনি গেয়েছে —ভাইটি রে, তোকে জেলে পুরে অস্ত্রগুলো হাপিস করেছে ওই মাস্টার। এখন ভালমানুষ সেজে গয়েরকাটায় গিয়ে বসেছে। বসেছে বলেই পুকুর ছেঁচে জানতে পারলাম অস্ত্রগুলো ওখানে নেই! সুভদ্র ছাড়া এই কাজ অন্য কেউ করতেই পারে না! ও হল একটা বজ্জাত!

হ্যাঁ, সত্যম এভাবেই বলেছে শ্যামলকে। শ্যামল কখনও হাপিস শব্দটা ইউজ করে না। ওটা সত্যম করে! শ্যামলকে আমার পেছনে লেলিয়ে দিয়েছে ওই শালা সত্যম।

আকাশ এক ফালি চাঁদকে নিয়ে মাঝে মাঝে মেঘের ভেতরে ঢুকিয়ে রাখছে। ফের অল্প অল্প বের করে দেখছে। এই আলোর ছায়া ছায়া চেহারায় আকাশ কেমন ঘোলাটে। আজ দুটো বড় কাজ এল। দুটো কাজ রে দাদা!

আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। চোখ বুজতেই ভেসে উঠল দুটো ছবি। এক, নিখিলের বাপটা চলে যাচ্ছে, দুই, শ্যামল চলে যাচ্ছে।

আরে ধ্যাত্তেরি! সব চলে যাচ্ছে কেন রে!

২৭

রাঘবের কথাটা মাথায় এল। রাঘবকে দিয়ে কাজটা করাবো নাকি অন্য অচেনা কারও হাতে কাজের ভার দেব? বার বার একই লোকের হাতে নির্ভর করলে একসময় তারই হাতের পুতুল হতে বাধ্য হতে হয়। রাঘবকে না জানিয়েই করে ফেলি? ছক সাজাতে বসলাম। এপারের নয়, বর্ডারের ওপার থেকে লোক আনতে হবে। একটা সময় রাঘবই এই লোকটার সন্ধান দিয়েছিল। এখন, সেই লোকের নাম, ফোন নম্বর যে আমার কাছে আছে, তা মনে নেই নিশ্চয় রাঘবের। একজনকে দিয়ে বারবার কাজ করাতে চাই না, তাছাড়া আরও যারা এই লাইনে আছে, তারা করে খাক। ফোনের নম্বর সিওর

সেভ করেছি। নামটা হল এস দিয়ে। সরিফুল... সাদ্দাত্... সাজিদ ফলওলা... আরে, সাজিদ ফলওলা মানে এটা কোড নেম। খুব দরকারী লোকের নাম এভাবে লুকিয়ে রাখি সবার সামনে। সাজিদ ফলওলার বর্ডারের ওপারে ফলের আড়ত আছে। পেছনে আছে অন্য ব্যবসা। আমি সেই ছুপা রুস্তমের খোঁজ চাই। এখনই ফোন করতে হবে। ভোর ছ'টা। যারা কাজ করে, তাদের কাছে কিবা রাত কিবা দিন। ইয়েস, রিং হচ্ছে!

—হ্যালো সাজিদ ভাই? কেমন আসেন? আমি বর্ডারের এই পার থিকা বলতেসি। একখান বালা কাম আসে। বালা মানি পাইবেন।

—কেডা বলতেসেন?

—রাঘবরে সিনেন তো? কলকাতায় থাকি। আমার দোস্ত। একখান বড় কামের জন্য রাঘব আপনের সঙ্গে কতা হইসিল। পরে সেই কাম আর হয় নাই। সেই বুড়িডারে ছুরি মারার কাজডার কতা মনে আসে? তো কতা সিলো একখান। দেহা করনের ব্যবস্তা করতে পারলে হয়। কোথায় দেহা হয় কন। আপনেই কন। যদি কন, বুসসেন? আপনে যদি কন আমি কুচবিহারে যাইতে পারি।

—কিছু বলতে পারিনা। দেহা করনের সময়ও নাই।

—না না, এই কতা কইবেন না ভাই। বালা কাম।

—কামডা কী?

—দেহা করি কাইল? কুচবিহারে?

—স্যাংরাবান্দায় চলি আসেন। বর্ডারের মুখডায়।

—আসসা ভাই। কাইল কতা হবে। কিন্তু একখান কতা আসে। আপনে রাঘবরে কিছু জানাইবেন না। ও ভাববে, আমারে না দিয়া বড় কাম সাজিদরে দিল!

—ঠিক আসে। একটা কতা ভাই, গদ্দারি করবেন না।

—ধুর ধুর। পাগল হই নাই ভাই। আপনেরে আমার দরকার। এইটা একখান বিশ্বাসের কতা।

—তাইলে এই কতাই ঠিক অইল। সাড়তেসি। ফোন ছেড়ে দিল সাজিদ।

কাল চ্যাংড়াবান্দায় যাব। কিন্তু সাজিদ রাঘবের সঙ্গে কথা তো বলেই নেবে। রাঘবের সঙ্গে কথা বলে নিই। একটু ঘুরিয়ে রাখি পুরো ব্যাপারটা।

রাঘবের সঙ্গে কথা হল। রাঘব এখনই নর্থবেঙ্গলে আসতে চাইছে না। পরপর একই জায়গায় কাজ করা ওর নীতির বিরুদ্ধে। আমি এটাই চেয়েছিলাম। খুবই দুঃখিত হওয়ার ভান করতে হল।

—আচ্ছা, দেখি কী করা যায়। নাহলে তোমাকে জানাতে হবে। ফোন রেখে শ্বাস ফেললাম। এবারে কুচবিহার... না, চ্যাংরাবান্দা। অনেকদিন আগে একবার চ্যাংরাবান্দায় নীতিশদার বাড়িতে গিয়েছিলাম। নীতিশদা বহুদিন হল চলে গেছেন শিলিগুড়ি। এখন অবশ্য সেখানে পরিচিত কেউ নেই। না থাকাই ভাল। চেনা লোকের সংস্পর্শে আসতে চাই না এখন!

পরদিন খুব ভোরে বেরিয়ে পড়লাম। চ্যাংরাবান্দা পৌঁছে বর্ডারের কাছাকাছি গিয়ে একবার মিসড কল দিলাম। ওদিক থেকে সাজিদের মিসড কল এল। মোট কথা সাজিদ আসছে। নিশ্চয় রাঘবের সঙ্গে কথা হয়েছে। কী কথা হল বুঝতে অসুবিধে নেই। রাঘব জেনে গেল আমি সাজিদের সঙ্গে কাজ করছি। জানুক। কিছু অসুবিধে থাকবেই। ওসব মেনে নিয়ে চলতে হবে। যখন যেমন তখন তেমন চাল চালতে হবে। দাবা খেলতে বসেছি। ভুলে গেলে চলবে না!

“পরদিন খুব ভোরে বেরিয়ে পড়লাম। চ্যাংরাবান্দা পৌঁছে বর্ডারের কাছাকাছি গিয়ে একবার মিসড কল দিলাম। ওদিক থেকে সাজিদের মিসড কল এল। মোট কথা সাজিদ আসছে। নিশ্চয় রাঘবের সঙ্গে কথা হয়েছে। কী কথা হল বুঝতে অসুবিধে নেই। রাঘব জেনে গেল আমি সাজিদের সঙ্গে কাজ করছি। জানুক। কিছু অসুবিধে থাকবেই।”

মাঝারি হাইটের লোকটি এল ঘোরাঘুরি করতে করতে। লুঙ্গিতে নীল সবুজ চেক কাটা। কালো লোকটা কুতকুতে চোখে সন্দেহ নিয়ে আমাকে যাকে বলে ওয়াচ করছিল। এক সময় এসে আমার পাশের বেঞ্চে বসল —আপনে ইন্ডিয়া থিকা আসতেসেন? কাউরে খুজেননি?

একটা কাচের গেলাসে দুধ চা খাচ্ছি। আমার লিফ লিকার খাওয়ার অভ্যেস। এখন যা পাচ্ছি, এই ঢের। লোকটা সাজিদের চর মনে হচ্ছে। কাস্টমার সেজে স্পাই কিনা বুঝে নিচ্ছে। এই লোকগুলো মারাত্মক হিংস্র হয়।

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ভ্রু তুললাম —আপনের তাতে কী? একজনারে খুঁজি, সে ইহানেই আসবে বলছিল... কিন্তু হের নাগাল পাইনা। আসবে। বলছে যহন, কতা রাখার লোক সে।

—নাম কী?

—সাজিদ ভাই। ফলের বিজনেস।

লোকটা ইতিউতি তাকিয়ে সরে গেল। খেয়াল করলাম একটা মোটা গাছের পেছনে গিয়ে ফোন করছে। সাজিদকে খবর দিচ্ছে। মানে সাজিদ এল বলে।

কাল অনেকক্ষণ বৃষ্টি হওয়ায় তাপমাত্রা নেমে গেছে। ফের বৃষ্টি আসবে। ঠান্ডা বাতাসে শীত শীত করছে।

—বলেন। মোটাসোটা লোকটার পরনে চেক লুঙ্গি। লম্বা সাদা পাঞ্জাবি। মাথায় ফেজ টুপি। গলার দু' পাশ দিয়ে নেমে এসেছে চেক কাটা স্কার্ফ।

বুঝলাম এই সেই সাজিদ ভাই। ওদের কায়দায় সেলাম করে দাঁড়াতে আমাকে নিয়ে একটা গাড়িতে ওঠালো। খানিকটা গিয়ে ভ্যাপসা ইঁট ধ্বসা বাড়িতে তুলল। আসবাব বলতে একটা চৌকি। সেখানে বসতে বলা হল। সাজিদ ভাই মুখোমুখি বসে বলল —কী সমস্যা তাড়াতাড়ি বলেন।

সমস্যাটা গুছিয়ে বলতে হলে অনেক কথা বলতে হয়। অত কথার মধ্যে যাওয়ার দরকার বা কী? আমি সরাসরি মূল কথায় চলে এলাম —আমার দুইটা কাঁটা আছে ভাই। কাঁটাগুলা হাঁটা চলায় বড়ই কষ্ট দিতেছে। একটু সাহায্য করেন যদি...!

—ক্যামন সাহায্য চান খুইলা বলেন। সাজিদ ভাই চোখ সরু করে আমাকে দেখে।

—একেবারে সরায় দ্যান। য্যান আমার হাঁটা চলার রাস্তায় ওদের দ্যাখতে না পাই, বোঝলেন?

—বোঝলাম। কিন্তু খচ্চা আসে। দুই দুইটা কাঁটা... আমরা জানের পরোয়া করি। এত বড় কাম আমার লোক করবে ক্যান? তাদের জানের পরোয়া নাই?

—কী যে কন! সেই কথা কি আমি জানি না? আমারে বুঝায় বলবেন, তবে বুঝব? কী খচ্চা বলেন। যা খচ্চা হবে, সে হবে। তাতে কী? খচ্চা করতে হইলে করতে হবে।

কথাবার্তা পাকা হল। দিনক্ষণ ঠিক হল না। ওটা আমি ঠিক করে সাজিদকে জানাব। সাজিদ বর্ডার পর্যন্ত এগিয়ে দিল। আমি চ্যাংরাবান্দায় ঢুকে পড়লাম। এখন বাড়ি ফিরব। শ্যামল কী করছে, কোথায় আছে দেখি গিয়ে। কাজ আর কাজ! নিখিলের বাবার ব্যাপারটা পাকা পোক্ত ভাবে সামলাতে হবে। শত্রুকে দুর্বল ভাবতে নেই। আঁটঘাট বেঁধেই কাজে নামছি বরাবরের মতো। কেউ কানের কাছে সারাক্ষণ ফিসফিস করে চলবে এখন থেকে। মন ওই ফিসফিসানি শুনতে থাকে। সাজিদের সঙ্গে ভালই আলোচনা হল। ভাগ্যিস আমরা বাঙাল। কথা বলতে সুবিধে হল। দাদু তো সবসময় বাঙাল ভাষাই বলতেন। ছোট থেকেই শুনেছি। আজ কেমন কাজে লেগে গেল!

কাঁটা সরাও সুভদ্র। বিপজ্জনক কাঁটা এরা। সাবধান! সেই ফিসফিস আবার!

(ক্রমশ)

স্কেচ: দেবরাজ কর

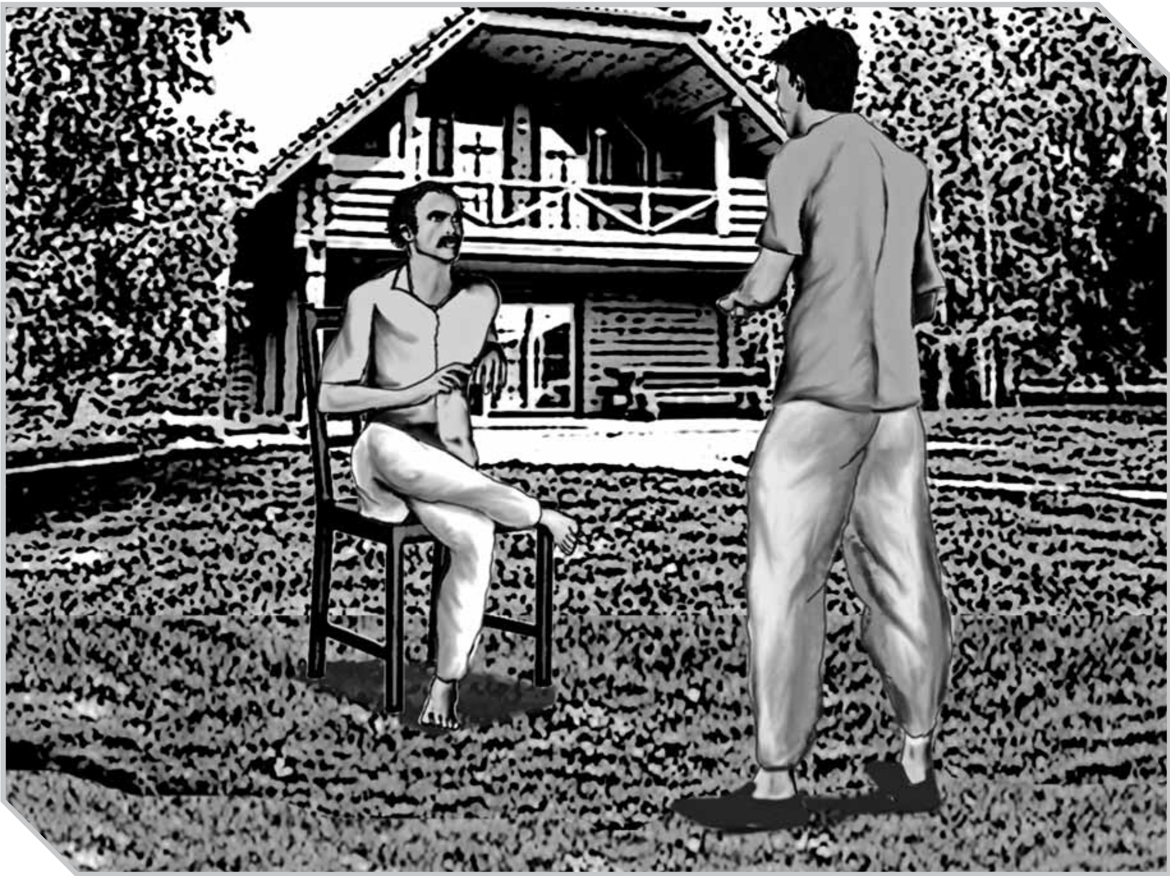

তরাই উতরাই

৬২

রাত জেগে অভিনয় দেখার ক্লান্তির কারণে ভোর বেলায় বাড়ি ফিরে হিদারু অনেকটা সকাল পর্যন্ত ঘুমলো। সে ঘুম ভাঙল পাশের ঘরে চেনা একটা গলার আওয়াজে। সেটা সেজদার গলা। হিদারু তড়াক করে বিছানা ছেড়ে চোখেমুখে জল ছিটিয়ে পাশের ঘরে ঢুকে দেশি ভাষায় বলল, 'তুই কখন এলি? ডাকিসনি কেন?'

সেজদা চিত্তর সঙ্গে কথা বলছিল। ছোট ছেলে সুভাষ হাঁ করে শুনছিল সে সব কথা। সেজদা ভালো গল্প করতে পারে। কিন্তু হিদারুকে দেখে সে একটু সঙ্কুচিত হয়ে বলল, 'ঘুমাচ্ছিলি। শুনলাম থিয়েটার দেখেছিস গঙ্গা ব্যানার্জির বাড়িতে— তাই আর ডাকিনি।'

'তুই বস। আমি স্নানটা সেরে নিই। দুপুরে খেয়েদেয়ে ফিরবি।'

'আমি এখনই যাব। তুই বস। কথা আছে।'

হিদারু একটু অবাক হল। সেটা প্রকাশ না করে ছেলেদের বাইরে যেতে বলে সেজদার মুখোমুখি মাদুরে বসে জিগ্যেস করল, 'সিরিয়াস কিছু ঘটেছে নাকি?'

সেজদা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আমরা ঠিক করেছি সবাই পইতে নেব। হিন্দু রাজবংশীদের এটা কর্তব্য।'

হিদারু হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলল, 'আর মুসলিমরা? আমাদের মধ্যে মুসলিমরা নেই? তাঁরা গলেয়া দই চিঁড়ে দিয়ে খেতে ভালোবাসে না? তাঁরা কি আলাদা হয়ে যাবে?'

'শোন ভাই।' সেজদা নরম গলায় বোঝাতে চায়। 'মুসলিমদের ভাবনা লীগ ভাববে। আমরা হলাম হিন্দু।'

'না।' হিদারু মাটিতে একটা ঘুঁসি মেরে দাঁড়িয়ে পড়ে। 'আমরা হিন্দু না, মুসলিমও না! আমরা রাজবংশী!'

'তাহলে কি তুই পঞ্চা ঠাকুরকে মানিস না?'

'না! মানি না!'

উত্তেজনার চোটে চিৎকার করে কথাটা

বলার পর হিদারু একটু লজ্জা পেল। পঞ্চানন বর্মাকে অবজ্ঞা করার সাহস বা ইচ্ছে— কোনওটাই তাঁর নেই। কিন্তু উপবীত ধারণ করাটা কোনও সমাধান নয়। ভাটিয়া হিন্দুদের কাছে সে উপবীতের কোনও মূল্যই নেই।

'তোরা নিচ্ছিস নে।' নিজেকে সংযত করে বলল হিদারু। 'আমাকে এর মধ্যে টানিস না। পইতে পরাটাই সব নয় দাদা! আমাদের চাই শিক্ষা। আমাদের লেখাপড়া করতে হবে। নইলে আমাদের কোনও দাম নেই।'

'তুই লেখাপড়া জানিস। বড় বড় লোকদের সঙ্গে তোর ওঠাবসা। তোকে আমরা কী করে বোঝাব?' বলতে বলতে সেজদা উঠে পড়ল। 'আমাদের মধ্যে আর যাঁরা পড়াশুনো করেছে, তাঁরাও না পইতে পরছে! দেখছিস না?'

হিদারু কথা বাড়াল না। এ ব্যাপারে সে যে নিজের সমাজে সংখ্যালঘু সেটা তাঁর অজানা নয়।

স্নান খাওয়া সেরে গোপাল ঘোষের কাঠগুদামের দিকে রওনা দিতে দিতে সাড়ে এগারটা বেজে গেল। কুয়াশ কাটতে শুরু করেছে। হালকা রোদ্দুর মেখে দাঁড়িয়ে আছে শহরটা। বাতাসে বেশ কনকনে ভাব। আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেলে জমিয়ে ঠান্ডা পড়বে আবার। পাঠগোলার মাঠের সীমানা ঘেঁসে লম্বা টিনের ব্যারাক অংশে অংশে ভাগ হয়ে দোকান ঘর তৈরি হচ্ছে। কদমতলার চেহারাটা বদলে যাচ্ছে দ্রুত। মানজেন্নেছার বাড়ি পেরিয়ে কাদের আলির বাড়ি। তারপর গোবিন্দ সর্বাধক্ষ্যের দালান পেরিয়ে মাদ্রাস স্কুলের মাঠ। সেখানে দাড়িয়াবান্ধা প্রতিযোগিতার আয়োজন চলছে। মাঠের পূবদিকে কাজী দেলওয়ার হোসেন নতুন বাড়ি তুলেছেন। তাঁর বাড়ির পাশ দিয়ে রাস্তা চলে গেছে পাহাড়ি পাড়ার দিকে। উল্টোদিকে থাকেন কাজী আমির হোসেন।

হিদারু অন্যমনস্কের মতো হাঁটতে হাঁটতে গুদামে এসে দেখে গোপাল ঘোষ চলে এসেছেন। তিনিও গতরাতে অভিনয় দেখতে গিয়েছিলেন। গোটা রাত জেগে থাকার কারণে আর ঘুমোননি। সক্কাল সক্কাল নিজের আপিসে এসে বসে পড়েছেন।

'এসো এসো!' হিদারুকে ঢুকতে দেখে গোপাল ঘোষ খুশি হলেন। 'সকাল সকাল ভালই বাণিজ্য হল আজ। হিসেবপত্র কাগজে টুকে রেখেছি। খাতায় তুলে নিও।'

হিদারু একটু লজ্জা পেয়ে বলল, 'আরেকটু আগে আসতাম। কিন্তু মাথাটা এমন গরম হয়ে গেল— !'

'মাথা গরম? কার হল? তোমার?' খুব অবাক চোখে তাকালেন গোপাল ঘোষ। 'তুমি তো খুব ঠান্ডা মাথার লোক হিদারু! হঠাৎ কী হল?'

সেজদার সঙ্গে কথোপকথনটা সংক্ষেপে বিবৃত করল হিদারু। গোপাল ঘোষ একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'এ নিয়ে তর্কাতর্কি করলে কেন? এতে ভুল বার্তা পৌঁছোবে। তুমি একঘরে হয়ে যাবে। তোমার যুক্তি বোঝার মতো কেউ থাকবে না। উল্টে লোকে বলবে যে তুমি পঞ্চাননবাবুর বিরোধিতা করছ।'

হিদারু চুপ করে থাকল। গোপাল ঘোষ তাঁকে স্নেহ করেন। তর্কাতর্কি করাটা হিদারুর স্বভাব নয়। পঞ্চানন বর্মা চেয়েছিলেন যে উপবীত ধারণের মধ্য দিয়ে রাজবংশীরা ক্ষত্রিয় পরিচিতি গ্রহণ করে দেশের মূল জনস্রোতের অংশ হয়ে উঠুক। গোড়াতে এ নিয়ে তাঁদের সমাজে অনেক বিতর্ক হয়েছিল— কিন্তু এখন তা থিতিয়ে আসছে।

'যাক গে!' গোপাল ঘোষ পরিস্থিতিটা লঘু করার চেষ্টা করলেন। 'আগে দেশ স্বাধীন হ'ক

"গোপাল ঘোষের অনুমানে কোনও ভুল নেই। কিন্তু গগনেন্দ্রর কাছে হিদারু প্রতিজ্ঞা করেছে সেদিনের শিকার অভিযানের মূল গল্পটা সে কাউকে বলবে না। সেদিনের পর দু'-বছর কেটে গেছে। উপেনের আর কোনও সংবাদ জানা যায়নি। হিদারু তলে তলে খোঁজ নিয়েছে তারিনী বসুনিয়ার লোকজনদের কাছে। কেউই কিছু জানে না। তা হলে কি সত্যি সত্যি উপেন আর ডুয়ার্সে নেই?"

তারপর এসব নিয়ে ভাবা যাবে।'

'লীগ নিয়ে কিছু চিন্তা করেছেন?' হিদারু বিষয়টা থেকে পুরোপুরি সরে আসতে পারল না। 'মুসলিমরা কি সবাই লীগে যোগ দেবে?'

'বলা মুশকিল।' গোপাল ঘোষ গলা থেকে মাফলার খুলে বললেন। 'এ নিয়ে টাউনের মুসলিমদের মধ্যে দুটো ভাগ হয়েছে। ওদিকে আবার কংগ্রেসিদের কেউ কেউ হিন্দু মহাসভার প্রতি দুর্বল। এসব ভাল খবর নয়। তবে ভরসা এই যে গান্ধি আছেন।'

গান্ধিজির ভরসাটা হিদারুকে স্বস্তি দিল। সে বসল খাতাপত্র নিয়ে। দু'-জন খদ্দেরকে দেখা গেল কাঠগোলার ভেতরে প্রবেশ করতে। গোপাল ঘোষ তাঁদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এরপর ঘণ্টা দুয়েক বেশ ব্যস্ত থাকল হিদারু। খদ্দের দু'-জন রেল কোম্পানিকে কাঠের স্লিপার সরবরাহের বরাত পেয়েছেন। তাঁদের বাড়ি ময়নাগুড়ি। সরবরাহের ব্যাপারে তাঁরা গোপাল ঘোষের সহায়তা চান। বেলা তিনটে নাগাদ লোক দুটি ফিরে গেলে গোপাল ঘোষ ফাইফরমাস খাটার ছেলেটিকে জলখাবার আনার হুকুম দিয়ে হিদারুর মুখোমুখি বসে বললেন, 'তুমি জঙ্গলে যেখানে লুকিয়ে ছিলে সেই মিল মালিকের ঠিকানাটা দিও তো!'

হিদারু একটা কাগজে ঠিকানাটা লিখে দিয়ে বলল, 'আরও একটা ব্যাপার ঘটেছে দাদা। কাল অভিনয় দেখতে গিয়ে বিনয় মুস্তাফির সঙ্গে দেখা হয়েছে। তিনিই ডেকে কথা বললেন। গগন আর বীরেনের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে তাঁর। কিন্তু বদলি হয়ে চলে যাচ্ছেন বলে আমাকে কিছু বলতে চান। একটা ফাইল ক্লোজ করবেন বলছিলেন।'

'ফাইল?' গোপাল ঘোষকে অন্যমনস্ক দেখাল। 'আমি যদ্দুর জানি উপেনের ব্যাপারে মুস্তাফিই তদন্ত করছিলেন। মাস দুয়েক আগে খুদিদা খোঁজ নিতে গিয়েছিলেন থানায়। মুস্তাফি বলেছিল যে কোনও খবর নেই। তাঁর বিশ্বাস উপেন ডুয়ার্স ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেছে। এ নিয়ে তদন্তে তাঁর আর কোনও আগ্রহ নেই। লালবাজারকে জানিয়ে ফাইল বন্ধ করে দেবেন। —কিন্তু গগন আর বীরেনের খোঁজ করছিলেন বললে? গগন তো আজকালই আসছে শুনলাম?'

'উনি পরশু চলে যাচ্ছেন। হাতে সময় নেই।'

'একটা কথার সত্যি জবাব দেবে বঙ্কিম?'

হিদারু সতর্ক হল। সিরিয়াস কিছু বলতে গেলে গোপাল ঘোষ 'বঙ্কিম' কথাটা ব্যবহার করেন।

'বছর দুয়েক আগে পুজোর পর গগন আর বীরেন আমার বজরা নিয়ে শিকারে গিয়েছিল। তুমি তখন জঙ্গলে লুকিয়ে ছিলে। সে ব্যাপারে ওরা পরে নিশ্চয়ই তোমায় জানিয়েছিল?'

শিকারের নামে উপেনের সঙ্গে দেখা করার সংবাদ বিস্তৃতভাবে চিঠিতে লিখেছিল গগনেন্দ্র। কিন্তু হিদারুর বাইরে সে খবর আর কেউ জানে না। এমন কী শোভাও না। তাঁর দেওয়া বিপদতারিনীর তাবিজ জঙ্গলে হারিয়ে গেছে বলে গগনেন্দ্র সাফাই দিয়ে রেখেছিল।

'ওভাবে কেউ শিকারে যায় না।' গোপাল ঘোষ বলে চললেন। 'মাঝি মাল্লারা পরে আমাকে বলেছিল যে একজন মশাল নিয়ে পথ দেখিয়ে ওদের দু'-জনকে জঙ্গলের গভীরে নিয়ে যায়। কিন্তু গুলির শব্দ পাওয়া যায়নি। ওরা কি সত্যিই শিকার করতে গিয়েছিল?'

হিদারু কাঠের মতো বসে থাকল। কোনও উত্তর দিল না।

'হয় তো তোমাকে ওরা সত্যিটা জানায়নি। কিন্তু আমার ধারণা ওরা উপেনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল সেদিন।'

কলম নিয়ে নীরবে একটা কাগজে আঁচড় কাটছিল হিদারু। গোপাল ঘোষের অনুমানে কোনও ভুল নেই। কিন্তু গগনেন্দ্রর কাছে হিদারু প্রতিজ্ঞা করেছে সেদিনের শিকার অভিযানের মূল গল্পটা সে কাউকে বলবে না। সেদিনের পর দু'-বছর কেটে গেছে। উপেনের আর

কোনও সংবাদ জানা যায়নি। হিদারু তলে তলে খোঁজ নিয়েছে তারিনী বসুনিয়ার লোকজনদের কাছে। কেউই কিছু জানে না। তা হলে কি সত্যি সত্যি উপেন আর ডুয়ার্সে নেই? বক্সা জেল ভেঙে বন্দিদের ছিনিয়ে আনার পরিকল্পনা কি সে বাতিল করেছে?

নাকি তাঁর ধরা পড়ার সংবাদ শোনাবে বিনয় মুস্তাফি?

৬৩

বিনয় মুস্তাফি থানার সামনেই অপেক্ষা করছিলেন। গায়ে খয়েরি রঙের তিব্বতি সোয়েটার, গলায় মাফলার। দিনটা জব্বর ঠান্ডা। শরীর গরম রাখার জন্য হিদারু কাঁচা সুপুরি দিয়ে পান চিবোচ্ছিল। মুস্তাফিকে দেখতে পেয়ে সেটা গিলে ফেলে এগিয়ে গেল দ্রুত পায়ে।

'চলুন, চায়ের দোকানটায় বসি।'

বিনয় মুস্তাফি হাত তুলে ভবানী বাঁড়ুজ্জের দোকানটার দিকে ইঙ্গিত করে হাঁটতে শুরু করলেন। হিদারু অনুসরণ করল। বিজলি বাতি আসার কারণে ভবানী বাঁড়ুজ্জের দোকানের ভোল পালটে গেছে। এমনিতেই সেটা ছিমছাম, পরিপাটি ছিল। এখন বড় বড় তিনখানা ইলেকট্রিক বালব ঝোলার কারণে ঝলমলে ব্যাপারটা যুক্ত হয়েছে। সন্ধে ঘনাতে খানিকটা বাকি থাকলেও কুয়াশার কারণে এর মধ্যেই দোকানে দোকানে বাতি জ্বলতে শুরু করছে।

বাঁড়ুজ্জের দোকানে দু'-চারটে খদ্দের জোর গলায় কিছু একটা নিয়ে তর্ক করছিল। হিদারু সেদিকে তাকালোও না। বিনয় মুস্তাফি একদম কোণার একটা টেবিলে বসলেন। তাঁর মুখ দেখে হিদারু কিছু আন্দাজ করতে পারছিল না। উত্তেজনা চেপে রেখে সে নীরবে বসল মুস্তাফির মুখোমুখি।

'আমি বেশি সময় নেব না।' মুস্তাফি সরাসরি হিদারুর চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন। 'উপেনকে আপনি ভালই জানেন। সে নিরুদ্দেশ। তাঁর বাবা এলেমদার মানুষ। রায় বাহাদুর হওয়ার চান্স আছে। তিনি লালবাজারে যোগাযোগ করায় জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপারের কাছে উপেনকে খুঁজে বের করার জন্য অনুরোধ আসে। তারপর থেকে এখানে ডিপার্টমেন্টের হয়ে আমি তাঁকে খুঁজে চলেছি।'

'আমরাও তাঁকে খুঁজছি।' হিদারু সহজ হওয়ার চেষ্টা করল। মুস্তাফির মুখে বিশেষ কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। তিনি টেবিলে রাখা জলের গেলাস ঘোরাতে লাগলেন। কয়েক সেকেন্ড পর বললেন, 'ফাইনালি আমি তাঁকে প্রায় পেয়ে গিয়েছিলাম।'

'কোথায়?'

'বছর দুয়েক আগে পুজোর পর সাউথ বেঙ্গল থেকে দু'-তিনজন সশস্ত্র বিপ্লবী এদিকে শেলটার নিতে আর ইংরেজ বিরোধী অ্যাক্টিভিটিস চালু করার উদ্দেশ্যে এদিকে পালিয়ে আসে। আমাদের কাছে আগাম খবর থাকায় আমি তিস্তায় নজরদারি চালাচ্ছিলাম। সেদিন বীরেশ আর গগনবাবু শিকারে বেরিয়েছিলেন গোপাল ঘোষের বজরা নিয়ে।'

'আমি এসব পরে জেনেছি।'

'পরদিন সকালে তিনজন অচেনা যুবককে এলাকায় একজন স্থানীয় মানুষের সঙ্গে দেখা গিয়েছিল। এরা নদীতে স্নান করে একজনের বাড়িতে ভাত খায়। আমাদের স্পাই তাঁদের স্নান করার সময় কাছ থেকে লক্ষ্য করেছিল। ওদের একজনের বিবরণের সঙ্গে উপেনের হুবহু মিল। বাকিরা বিপ্লবী কি না, সেটা অবশ্য বোঝা যায়নি— কিন্তু পুলিশ তল্লাসিতে গিয়েছিল। জানা যায় যে চারজনই চাপড়ামারির

'লাশ?' হিদারু শিউরে উঠল যেন। 'কাদের লাশ?' 'লাশ বলতে প্রায় স্কেলিটন। তাই সবুজ জড়ুল ছিল কি না বোঝা যায় নি।' চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে শান্ত স্বরে বললেন মুস্তাফি। 'প্রচুর ফ্র্যাকচার। মনে হচ্ছে হাতি আছড়ে মেরেছিল। দুটো খুলির একটায় কষের দাঁত মিসিং। স্কেলিটনের হাইটটা উপেনের সঙ্গে খাপে খাপ মেলে বঙ্কিমবাবু!' গলায় আর্দ্র ভাব মিশিয়ে বাক্যটা সমাপ্ত করলেন বিনয় মুস্তাফি।

জঙ্গলের দিকে চলে গেছে।'

'বিবরণ শুনে এতটা নিশ্চিত হলেন কীভাবে? উপেনের চেহারার মতো মানুষের অভাব নেই।' হিদারু ঠান্ডা মাথায় জিগ্যেস করে। মুস্তাফি হাসেন। আবার টেবিলে গেলাস ঘোরাতে ঘোরাতে বলেন, 'লালবাজার থেকে পাঠান উপেনের ডিটেল আমার মুখস্ত। আপনি কি জানতেন যে উপেনের পিঠে সবুজ জরুল ছিল। কষের একটা দাঁত ছিল না।'

হিদারু স্তব্ধ হয়ে যায়।

'জঙ্গলটা খুব গভীর। তাই আমরা আর তল্লাসি করিনি। কিন্তু আমি শিওর যে ওটা উপেন ছিল আর আগের রাতে তাঁর সঙ্গে বীরেনবাবুদের সাক্ষাৎ হয়। অবশ্য তাঁদের এই কানেকশনের সূত্রটা ধরতে পারিনি। তারিনী বসুনিয়া হতে পারেন। সত্যি বলতে কি, বীরেনবাবুরা সেদিন শিকারে যাচ্ছিলেন না। ও ভাবে কেউ শিকারে যায় না— কিন্তু এভিডেন্স নেই।'

হিদারু চুপ করে থাকে। মুস্তাফি মোক্ষম তদন্ত করেছেন। তাহলে কি উপেন চাপড়ামারির জঙ্গলে লুকিয়েছে?

'দু-বছর আগে যখন জানলেন তখন ওদের জিগ্যেস করেননি কেন?' হিদারু এবার যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন করতে পেরে আত্মবিশ্বাস পায়। 'তা লে উপেনকে সবাই মিলে খুঁজে আনা যেত!'

'আমার মনে হয়েছিল যে উপেন জঙ্গল থেকে বের হলে আবার গগনবাবুদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে।' দিয়ে যাওয়া টি পট থেকে কাপে চা ঢালতে ঢালতে মুস্তাফি বললেন। 'সেক্ষেত্রে ওদের এসব জিগ্যেস করা মানে সাবধান করে দেওয়া। তাছাড়া উপেনবাবু কোনও অপরাধী নন। জঙ্গলে তাঁদের দেখা হওয়ারও কোনও প্রমাণ নেই। তবে তিনি চাপড়ামারির জঙ্গল থেকে বের হলে খবর পেতাম।'

'আমাকে ঠিক কী বলতে চাইছেন আপনি?'

'দু-সপ্তাহ আগে মালবাজার থানা একটা খবর পাঠায়। নতুন একটা চা-বাগানের পত্তন হচ্ছে ফরেস্ট ঘেঁসে। আসলে পুরো জমিটাই জঙ্গল কেটে বের করা হচ্ছে। গাছ কাটতে গিয়ে দুটো লাশ উদ্ধার হয়েছে।'

'লাশ?' হিদারু শিউরে উঠল যেন। 'কাদের লাশ?'

'লাশ বলতে প্রায় স্কেলিটন। তাই সবুজ জড়ুল ছিল কি না বোঝা যায় নি।' চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে শান্ত স্বরে বললেন মুস্তাফি। 'প্রচুর ফ্র্যাকচার। মনে হচ্ছে হাতি আছড়ে মেরেছিল। দুটো খুলির একটায় কষের দাঁত মিসিং। স্কেলিটনের হাইটটা উপেনের সঙ্গে খাপে খাপ মেলে বঙ্কিমবাবু!'

গলায় আর্দ্র ভাব মিশিয়ে বাক্যটা সমাপ্ত করলেন বিনয় মুস্তাফি। হিদারু দাঁড়িয়ে পড়েছিল। আবার বসে পড়ে অসহায় গলায় বলল, 'দাঁত না থাকাটা কোনও প্রমাণ না। আপনার কোথাও ভুল হচ্ছে!'

'সেটা নিশ্চিত করার জন্যই ওদের খোঁজ করছিলাম।' সোয়েটারের ভেতর হাত ঢুকিয়ে একটা খাম বের করে আনলেন মুস্তাফি। 'দাঁত না থাকা স্কেলিটনের গলায় এটা ছিল। এটাই আনতে গেছিলাম মালবাজারে।'

সোনার সরু চেইনে লাগান একটা মাদুলি খাম থেকে বেরিয়ে এল। হিদারুর দম বন্ধ হয়ে আসছে। এটা সে চেনে। শোভার গলায় থাকত। সে গগনকে দিয়েছিল। গগন দিয়েছিল উপেনকে।

'এমন জিনিস কি উপেনের কাছে থাকা সম্ভব ছিল? কাইন্ডলি যদি কিছু বলেন!'

মুস্তাফি কথাটা শেষ করে স্থির চোখে হিদারুর দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে চায়ের কাপ তুলে নিলেন। উত্তরের দরকার নেই। হিদারুর চোখ বেয়ে টপ টপ করে জল পড়ছে। একটু অপেক্ষা করে তিনি মোলায়েম কিন্তু গভীর গলায় বললেন, 'শক্ত হোন।'

অন্ধকার ছায়া ফেলে দিয়েছে কুয়াশা ঘেরা

হাংরি রিপোর্টার অ্যাংরি কলম

গত আশির দশকের গোড়া থেকেই চালু হয় উত্তরবঙ্গের প্রথম বাংলা দৈনিক। তারপর একে একে হিন্দি ও নেপালি। প্রত্যেকটির সূচনালগ্নের লড়াইতে জান হাজির ছিল তাঁর। এরপর পেটের এবং খবরের তাগিদে কলকাতায় চলে আসেন তিনি, আরেক ভিন্ন ধারার বাংলা দৈনিকে কাজ করবার বাসনায়। বলা যায় উত্তরের প্রতিনিধিত্ব করতেই। টানা চার দশক বাংলার এই সাংবাদিক জীবন নানান রঙের বৈচিত্রে ভরা। বহু ভিভিআইপি বহু জ্ঞানীগুণী এবং বহু ফেকলু-ফালতু বহুরূপী মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন এই দীর্ঘ সময়ে। বহু কেলেংকারির খবর গিলে ফেলতে হয়েছে নিজের কাগজের 'ভবিষ্যতের' কথা ভেবে। সবকিছুর পরেও শেকড় থেকে কখনই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাননি, উত্তরের মানুষ হয়ে বঞ্চনার নোনা স্বাদ পেয়েছেন বারবার। ফেলে আসা সময় যেমন ধরা পড়বে তাঁর কলমে, তেমনই মিডিয়ার দেউলিয়াপনার এই যুগে নয়া প্রজন্মের সাংবাদিককুল শিখে নিতে পারবেন সঠিক পেশাদারিত্ব।

আগামী এপ্রিল ২০১৮ সংখ্যা থেকে 'এখন ডুয়ার্স' পত্রিকার পাতায় নিয়মিত হাজির হচ্ছেন সেই তুষার প্রধান। তাঁর সুবিশাল অভিজ্ঞতার ঝুলি নিয়ে। হ্যাঁ আমরা জানি কোনও কোনও মহলের না-পসন্দ হবে এই স্মৃতিচারণ, কিন্তু আমরা নিরুপায়, বহু মানুষ অপেক্ষায় আছেন সেই ধারাবাহিক কাহিনির। তার সঙ্গে বহু দুর্মূল্য ছবি।

শহরে। এদিক ওদিক চলছে আগুন জ্বালিয়ে গা গরম করার প্রয়াস। ঘন হয়ে আসা অন্ধকারে আর ঝলমলে হয়ে উঠছে ভবেন বাঁড়ুজ্জের চায়ের দোকান। সেখানে তর্ক অব্যহত। দলে আরও তিন-চারজন যোগ দিয়েছে এর মধ্যে। ব্যাপারটা এতটাই জমেছে যে বাঁড়ুজ্যে নিজেই কান খাড়া করে শুনছেন সে তক্কো। অদূরে যোগমায়া মন্দিরে আরতি ঢাক বাজতে শুরু করল। তবে এসব আওয়াজ কানে ঢুকছিল না হিদারুর। সে চেষ্টা করছিল ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাওয়া কষ্টটাকে গিলে ফেলতে।

'আপনি কি আরেকটু বসবেন?' পনের মিনিট চুপ করে থাকার পর মুস্তাফি জিগ্যেস করলেন।

'না। চলুন।' হিদারু চাদের খুঁট দিয়ে চোখ মুছল।

'খুদিবাবুকে বলবেন যেন থানায় যোগাযোগ করেন। লাশ আইডেন্টিফাই করা দরকার। এই মাদুলি সেখান থেকেই ফেরৎ পাবেন। দরকারে যোগাযোগ করতে পারেন। আমার নতুন ঠিকানা থানাতেই পেয়ে যাবেন।'

বিপদতারিনীর তাবিজ খামে ভরে সোয়েটারের আড়ালে চালান করে দিয়ে বিল মিটিয়ে বেরিয়ে গেলেন বিনয় মুস্তাফি। হিদারু তাঁকে অনুসরণ করে একটা ঘোরের মধ্যে এসে দাঁড়াল রাস্তায়। হালকা কিন্তু হাড়ে কাঁপন লাগান ঠান্ডা হাওয়া এখনও সন্ধেটাকে কাবু করতে পারেনি। দশ-বারোজন ছেলের একটা দল বেরিয়েছে কংগ্রেস আপিসের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে চাঁদা তুলতে। তাঁরা হাততালি দিয়ে গান গাইতে গাইতে ঘুরছিল। হিদারু তাঁদের কাউকেই যেন দেখল না। আপন মনে তাঁদের পাশ দিয়ে হাঁটতে থাকল কদমতলার দিকে। কিন্তু আসলে সে হাঁটছিল লক্ষ্যহীন। প্রতি মুহূর্তে উপেনের অনুষঙ্গে মিশে যেতে যেতে হিদারু হাঁটছিল কিছুক্ষণ একা থাকার জন্য। সে কাউকে দেখছিল না। তাই কদমতলা পেরিয়ে রেল লাইনের কাছে এসে সে দেখল চারদিক গভীর অন্ধকার। একটি দুটি গরু-মোষের গাড়ির যাওয়া আসা কেবল।

সে থেমে গেল। তাঁর মনে পড়ল এমন এক অন্ধকারে কাছাকাছি থাকা একটা বাড়ির কথা। সেই অপূর্ব উত্তেজনা রাতটায় তাঁরা বার্তা পেয়েছিল উপেনের। নিঝুম অন্ধকারের ওপাড়ে থাকা সেই বাড়িটা যেন ডাকল তাঁকে। সে বাড়িটাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করল হিদারুর। সে পাথরের রাস্তা ছেড়ে নেমে গেল উত্তরের কাঁচা পথে। অন্ধকারে কিছুটা ঢালু পথে নেমে চলে গেল সে।

৬৪

হিদারু চলে গেল।

মনসা পুজোর দিন রাজবাড়ির মেলায় বসে সে আমাকে শোনাচ্ছিল তাঁর অতীত-ভবিষ্যতের কাহিনি। উপেনের মৃত্যু সংবাদে সে কাহিনির মঞ্চে যবনিকা ফেলে দিয়ে সে চলে গেল অন্ধকারে। ডুয়ার্সের হরিদ্রা আত্মা আমাকে সময় পাড়ি দিয়ে নিয়ে ফেলেছিলেন হিদারুর যুগে। সে যুগ হারিয়ে গেল। আমি শুকিয়ে যাওয়া তিস্তার চরে শীতের দুপুরে চড়ুইভাতি করতে আসা লোকজনের কোলাহল শুনতে শুনতে দেখলাম হরিদ্রা আত্মা মিটিমিটি হাসছেন।

'উপেন তা হলে নায়ক নয়। নায়ক তো মরে না।' আমি তাঁকে জানাই। 'গল্পটা তবে হিদারু রায়ের?'

আত্মা হাসলেন। আমি লক্ষ্য করে দেখেছি যে হিদারুর যুগে আত্মাকে ঘন সবুজ দেখায়। এখন একটু ধূসর লাগছে। আমি জানতাম যে গল্পের নায়ক নিয়ে তিনি কিছু বলবেন না। বললেনও না। স্মিত হেসে মিলিয়ে গেলেন। আমি হাঁটতে লাগলাম বাঁধের ওপর দিয়ে। চওড়া, উঁচু বাঁধের একদিকে শুকনো তিস্তা আরেক দিকে রোগগ্রস্তা করলা। মানুষ, মন্দির, মাইক, টিভি। আমি সব উপেক্ষা করে হাঁটতে লাগলাম। হাঁটতে হাঁটতে টের পেলাম যে হিদারু ঠিক এভাবেই হাঁটছিল। হাঁটতে হাঁটতে চলে গিয়েছিল অন্ধকারে। আমিও হাঁটতে লাগলাম হুবহু সে ভাবেই। হাঁটতে হাঁটতে অনুভব করতে পারলাম চারপাশ হারিয়ে যাচ্ছে। শীতের শুকনো হাওয়া বদলে যাচ্ছে শ্রাবণের ভিজে বাতাসে। চারপাশে সব শব্দ বদলে যাচ্ছে ছল ছল, কল কল ধ্বনিতে।

হাঁটতে লাগলাম। মাথার ওপরে শ্রাবণের ভারি ও বিষণ্ণ আকাশ। পুব দিকে দিগন্ত প্রসারিত জলরাশি ঘুরপাক খেয়ে ছল ছল শব্দে ছুটছে। হাঁটতে হাঁটতে যেন পিছিয়ে যাচ্ছি। কিং সাহেবের ঘাটের দিকে ধীর গতিতে ভেসে আসছে ছোট বড় হরেক কিসিমের নৌকো। সে সব নৌকো থেকে নামা মানুষগুলো আমার চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি তাঁদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছি অশরীরির মত। হিদারু রায়ের জলপাইগুড়ি অজস্র, অসংখ্য গাছপালায় ঢাকা এক বিরাট গ্রামের মত। বড় সাজান গোছান, পরিচ্ছন্ন। প্রাণবন্ত সেই গ্রামীণ শহর আমাকে ছাড়ে না। কিন্তু আমি কেন সেখানে থাকব? আমি তো বর্তমান। আমি ফিরে আসতে চাই। তবুও সে আমাকে ছাড়ে না। আমি ফিরে আসতে চাই বাস্তবের জলপাইগুড়িতে— সে আটকে রাখে এক মায়াবি স্বপ্ন আঁঠায় জড়িয়ে। আমি বাধ্য হয়ে চিৎকার করে জলকল্লোলিত তিস্তাকে বলি, 'ছেড়ে দাও! ওই শহর মরে গেছে। আমাকে জীবিত শহরে পৌঁছে দাও।'

তিস্তা উত্তর দেয় না। পাহাড় থেকে নেমে এসে তরাই পেরিয়ে উৎরাই-এর দিকে ছুটে চলা নদী কেবল বইতে থাকে। শহরকে আরও একবার তছনছ করার গুপ্ত ষড়যন্ত্র পলিময় ঘোলা জলে মাখিয়ে নিয়ে বইতেই থাকে।

(সমাপ্ত)

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

স্কেচ: দেবরাজ কর

ডুয়ার্সের হেথা হোথা

দেবী ভ্রামরীর গ্রামে

চারদিকে চারটে বাড়ি। তিনটে পুরনো। মাটির মেঝে খড়ের দেয়াল। চার নম্বরটা পাকা এবং নির্মিয়মান। পঞ্চায়েত থেকে ‘ঘরের টাকা’ মিলেছিল পুরোটাই। কিন্তু সে টাকার বেশ খানিকটা এদিক ওদিক কীভাবে খরচ করে ফেলেছে, গেরস্ত সেটাই বোঝাচ্ছিলেন। গেলবার আলু ফলিয়ে ডাহা লোকসান হয়েছিল। ঘরের টাকা মহাজনকে দিতে হয়েছে। এ সব দুর্যোগ, দুর্বিপাক না হলে পাকা ঘরে এদ্দিনে টিনের চাল বসে যেত!

বসে আছি গেরস্তের উঠোনে। বারোটা লাল প্লাস্টিকের চেয়ার আর দুটো কাঠের বেঞ্চিতে জনা বিশেক লোক বসে আছি। আসলে আমরা এগার জন এসেছি ছেলে দেখতে আর বাকিরা পাত্রপক্ষের লোক। এ ছাড়াও আমার পেছনে যে খড়ের বাড়িটা আসলে রান্নাঘর, সেখানে অন্তত আধ ডজন বিভিন্ন বয়সের মহিলা। আমার সামনে একটা টুলে পান-সুপুরি-বিড়ি-দেশলাই। পাত্রের বাবা ইনিয়ে বিনিয়ে যেটা বোঝাতে চাইছিলেন তা হল এই যে পাকা ঘরটির নির্মাণ সমাপ্ত করার জন্য তিনি ‘ডিমান্ড’ নেবেন। ঘরই যদি না হল তবে বউ নিয়ে ছেলে থাকবে কোথায়?

স্থান বোদাগঞ্জ। অলস এবং হাওয়াময় বসন্ত দুপুরের শেষ। আমি পাত্রীপক্ষের লোক। দেশীয় বিয়েতে পণকে বলা হয় ‘ডিমান্ড’। পাত্রীর বাবা চেয়ারে বসে দ্রুত লয়ে হাঁটু নাড়াচ্ছেন। আমি বুঝলাম, এ বিয়ে হবে না। কারণ পাত্র কোথায় চাকরি করে সেটা খুব সন্দেহজনক। দেশীয় বিয়েতে মেয়ে পক্ষ ছেলের বাড়ি গিয়ে ছেলেকে রীতিমত কড়া ধাঁচের জেরা করতে ছাড়ে না। একটু আগেই সে জেরায় ছেলে জেরবার হয়ে ‘ভক্তি দিয়ে’ এক কোণায় আসামির মত দন্ডায়মান।

মেয়ের দাদু আমার কানে ফিস ফিস করে বললেন, ‘ঘর কমপ্লিট করতে ডিমান্ড লাগবে। তার মানে ছেলে অত বেতন পায় না!’

ছেলের দাবী সে রেলের সিকিউরিটি গার্ড এবং মাইনে পায় বারো হাজার।

গ্রামটা বেশ সবুজ। চারদিকে হরেক রকম কচিপাতা। বিয়ে হোক বা না হোক, থাকতে হবে আরও দু’-তিন ঘণ্টা। খাওয়াদাওয়ার জম্পেশ আয়োজন হচ্ছে। অবশ্য সে ভোজের উদ্যোক্তা পাত্রপক্ষ নয়। পাত্রীর কোনও আত্মীয়— যাঁর সূত্রে এখানে ছেলে দেখতে আসা। দুটো বাড়ি পরেই তাঁর নিবাস। তিনি একটি দু’-কামরার পাকা ঘর বানিয়ে ফেলেছেন অবশ্য। তাঁর মেয়ের সবুজ সাথীর নীল সাইকেল নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম। দু’-দিকে খানিকটা গেলে দুটো মন্দির। শিকারপুরের দেবী চৌধুরানী আর বোদাগঞ্জের ভ্রামরী দেবীর।

জলপাইগুড়ি শহর থেকে রোড স্টেশান লাগোয়া লেবেল ক্রসিং টপকে একটু এগলেই ডেঙ্গুয়াঝাড় চা-বাগান। এইট বা নাইনে পড়াকালীন একবার সাইকেল চালিয়ে এই বাগানে এসেছিলাম সপ্তমীর সকালে। বাগানের পুজো দেখতে। ক্লাসমেট তরুণ পন্ডিতের বাবা ছিলেন বাগানের ডাক্তার। সেটাই ছিল প্রথম এ পথে আসা। ভ্রামরীদেবীর মন্দির তখনও ভবিষ্যতের ভ্রূণে। চা-বাগানের পাশ দিয়ে রাস্তাটা দিয়ে বোদাগঞ্জের জঙ্গলে যাওয়া যায়— এটাই জানা হয়েছিল। গাজলডোবাও তখন সেলেব্রিটি হয়নি।

আর শুনেছিলাম শিকারপুরের দেবী চৌধুরানীর মন্দিরের কথা। কলেজে উঠে সে মন্দিরের উদ্দেশে সাইকেল নিয়ে জনা কয়েক যাত্রা শুরু করে এক ভয়াবহ পথ পেরিয়ে হাজির হই ভ্রামরীদেবীর মন্দিরে। আসলে রাস্তা ভুল করেছিলাম। ভ্রামরী মন্দির তখনও ছিল না, কিন্তু লালবস্ত্র পরিহিত এক সন্ন্যাসীর কথা জানা গিয়েছিল।

এরপর সুযোগ হলেই সেখানে যেতে শুরু করলাম। তিস্তার ধারে এক জঙ্গলময় নিঝুম পরিবেশ। একটা কাঁচা রাস্তা চলে গেছে শিকারপুরের দিকে। সেই সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হল। একটা গাছের নিচে বাঁশ, লাঠি, খড়, পলিথিন দিয়ে কোনও মতে একটি মন্দির বানিয়েছেন। প্রতিদিন পুজোর প্রসাদ হিসেবে একটা করে বাতাসা বিতরণ করেন। এটাই নাকি দেবীর আদেশ। তিনি না দেখালে সে মন্দির আমাদের চোখেই পড়ত না।

সন্ন্যাসীর নাম লালবাবা। আমার মনে হল যে একে আমি জলপাইগুড়িতে কোথায় জানি দেখতাম।

টানা চার-পাঁচ বছর বেশ কয়েকবার সেখানে যাওয়া হয়েছিল সেই তল্লাটে। গাজলডোবায় ব্যারেজ নির্মাণের কাজ তখন জোর কদমে শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু সেদিকে যাওয়ার রাস্তা নরকের চাইতে খারাপ। শিলিগুড়ি যাওয়ার বিকল্প রাস্তাটির চেহারা ছিল তার তুলনায় কিঞ্চিৎ ভালো। আমরা শিকারপুর যেতাম বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্ট ঘেঁসে ভ্রামরীদেবীর বর্তমান মন্দিরের পাশ দিয়ে একটা সরু পথ ধরে। সে এক অদ্ভুত গ্রামাঞ্চল। জঙ্গল কোথাও কাছে, কোথাও গায়ের ওপর। জনঘনত্ব বেশ কম। এদিকে বেলাকোবা কী ওদিকে জলপাইগুড়ি যেতে হলে প্রধান ভরসা সাইকেল। বেশির ভাগ খেত অচষা। সরু ভাঙা রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ এক চিলতে বাজার। পেল্লায় মাঠওয়ালা প্রাইমারি স্কুল। ঘরের পেছনে হাতির পটি। মনে হত যেন পরিত্যক্ত জনপদ। উপায় নেই বলে কিছু কিছু মানুষ রয়ে গেছেন।

লালবাবার পরিচয় পরে মনে পড়েছিল কোনও এক আড্ডায়। কৈশোরে আমার ক্যারাটে শেখার ইচ্ছে হয়েছিল। একটি আশ্রমে যেতাম শরীরচর্চার কারণে। ইচ্ছেটা মাস দেড়েক স্থায়ি ছিল। লালবাবা ছিলেন সে আশ্রমের গোশালার পরিচালক। তাঁকে আমি সেখানেই দেখেছিলাম। তাঁর পরবর্তী কাহিনি বেশ অলৌকিক। সে কাহিনি আমায় বলেছিলেন আশ্রমের এক দায়িত্ববান ভক্ত।

গোপরিচর্যার কাজ করতে করতে লালবাবা একবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আশ্রম থেকে যথাসাধ্য চিকিৎসা করানো হল, কিন্তু জানা গেল তাঁর দুটো কিডনি প্রায় জবাব দিয়ে দিয়েছে। বাঁচা অসম্ভব। এই অবস্থায় একদিন তিনি আশ্রমের মহারাজকে জানালেন এক স্বপ্নের কথা। স্বয়ং কালীঠাকুর তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর পুজো করার জন্য। শর্ত একটাই। প্রতিদিন যৎকিঞ্চিৎ হলেও পুজোর প্রসাদ বিতরণ করতে হবে। এটাই তাঁর রোগ নিরাময়ের একমাত্র পথ।

ফলে, গোশালার চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি বোদাগঞ্জে এসে তিস্তার পাড়ে ভ্রামরী দেবীর মন্দির নির্মাণের ব্রত নিয়ে কাজ শুরু করলেন। ভিক্ষা করে খরচ, পুজোর প্রসাদের খরচ তুলতেন। গোড়ায় দু’-পাঁচটি নকুল দানা বা একটা বাতাসা বিলি করতেন প্রসাদ হিসেবে। ক্রমশ দেখা গেল যে ডাক্তারদের আশঙ্কা ভুল

প্রমাণ করে তিনি দিব্যি সুস্থ হয়ে উঠছেন। বিশ্বাস খুব শক্তিশালী ভিটামিন। বিশ্বাসের বলে মানুষ অসাধ্য সাধন করতে পারে।

সেই কয়েক বছরের পর অনেক দিন আর ওদিকে যাইনি। তারপর একদিন ভ্রামরী দেবীর মন্দির বিখ্যাত হয়ে গেল। লালবাবার প্রচুর ভক্ত হল। মন্দিরের সামনে দিয়েই হাতিদের যাওয়া আসার করিডোর। মন্দিরে বার কয়েক হামলাও চালিয়েছে তারা। সম্ভবত শিবের দেশে কালিকার আগমনকে তারা ভালো চোখে দেখেনি। ভ্রামরী মন্দিরগামী রাস্তার চেহারা বেমালুম বদলে গেছে। কিন্তু গাজলডোবা যাওয়ার রাস্তা এখনও বেশ খারাপ।

সবুজ সাথির সাইকেলে চড়ে আমি ভ্রামরী মন্দিরের দিকেই যাব বলে ঠিক করে নিলাম। কারণ মাত্র তিন চার মাস আগে দেবী চৌধুরানীর মন্দিরে চক্কর মেরে এসেছি, তুলনায় ভ্রামরীর মন্দিরে বেশ কয়েক বছর আসা হয়নি। সাইকেলের মালিক এগার ক্লাশের মেয়েটি তাঁর বাহনের প্রতি বেশ যত্নবতী। সাইকেল ভালোই চলছে। পাতাঝরা জঙ্গলের পাশ দিয়ে মন্দিরের সামনে আসতে বেশ ভিড় নজরে এল। এই মন্দির এখন অন্যতম সতীপীঠ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

ভ্রামরী দেবীর মন্দিরকে অন্যতম সতীপীঠ হিসেবে প্রমাণ করার জন্য এই শতকের গোড়ার দিকে একদল ভক্ত উঠেপড়ে লেগেছিলেন। তাঁদের অন্যতম ছিলেন এক তান্ত্রিক কাম জ্যোতিষী— যিনি নিজেকে পরিচয় দিতেন পন্ডিত শুক্রাচার্য নামে। পরিচিতরা তাঁকে ডাকত ‘সেন দা’ নামে। তাঁর একবার খেয়াল চেপেছিল যে ভবানী পাঠককে নিয়ে একটা ভিডিও ছবি বানাবেন। এক দেয়ালীর রাতে তাঁর গাড়ি চেপে ভ্রামরী মন্দিরে এসে আমরা একদল হাতির পাল্লায় পড়েছিলাম। ঘুটঘুটে অন্ধকারে গাড়ির মধ্যে বসে তুমুল হইচই আর পটকা ফাটার শব্দ শুনতে শুনতে সতীপীঠের সম্ভাবনা বিষয়ে পন্ডিতকে চেপে ধরতে তিনি স্বীকার করলেন যে শাস্ত্রমতে সতীপীঠটা এদিকেই কোথাও ছিল, কিন্তু সেটা আর জানার উপায় নেই।

তান্ত্রিক মশাই হাতির ভয় কাটাবার জন্য বেশ খানিকটা সুরা পান করে ফেলেছিলেন। ফলে তাঁর মেজাজ বেশ প্রফুল্ল ছিল। ঘন্টা দুয়েক পর যখন বনবিভাগের লোকজন ‘হাতি ক্লিয়ার’ বলে জানাল ততক্ষণে সুরার বোতল প্রায় ফাঁকা এবং পন্ডিত শুক্রাচার্য খাঁটি দৈত্যগুরুর ভঙ্গিতে হা হা করে হাসতে হাসতে বলছেন, ‘আরও মন্দির হবে! কম্পিটিশন লেগে যাবে’। তান্ত্রিক শুক্রাচার্যের জ্যোতিষ বিষয়ক ভবিষ্যৎবাণী নিয়ে প্রচুর সন্দেহ থাকলেও উক্ত ভবিষ্যৎবাণীটি যে মোক্ষম ছিল তায় সন্দেহ নেই। সত্যিই এখন কম্পিটিশন! একের পর এক মন্দির গজিয়ে উঠছে ভ্রামরী মন্দিরের কাছাকাছি— কালিয়াগঞ্জ বাজার থেকে নতুনবস কিংবা গাজলডোবার পথে। কিন্তু ভ্রামরীকে চ্যালেঞ্জ জানাবার মত লায়েক হয়ে ওঠেনি কেউ।

সাইকেল থেকে নামলাম। ভিড়টা আসলে পুজোর নয়, বিয়ের। বহু নবদম্পতি সংসারের কুম্ভীপাকে পড়ার আগে মধুর দাম্পত্যের আশায় এই মন্দিরে আসেন। অনেকে বিয়েটাই সেরে ফেলেন এখানে। গান্ধর্বমতে বিবাহের অন্যতম চমৎকার স্থান হিসেবে এ মন্দিরের খ্যাতি আছে। বর্তমান বিয়েটা দুই আদিবাসী পরিবারের। বর-বউ ছাড়া বাকিরা সবাই তুরীয় মেজাজে। গলায় গাঁদা ফুলের মালা পরে একজন বেশ হম্বিতম্বি করছিল। জানা গেল তিনি ছেলের বাপ।

গাজলডোবার পথে গিয়ে এর আগে এই সময় লম্বা লম্বা, মোমবাতির মতো দেখতে এক ধরনের ফুল দেখতাম পথের ধারে। হলুদ রঙের

> ভ্রামরী দেবীর মন্দিরকে অন্যতম সতীপীঠ হিসেবে প্রমাণ করার জন্য এই শতকের গোড়ার দিকে একদল ভক্ত উঠেপড়ে লেগেছিলেন। তাঁদের অন্যতম ছিলেন এক তান্ত্রিক কাম জ্যোতিষী— যিনি নিজেকে পরিচয় দিতেন পন্ডিত শুক্রাচার্য নামে।

ফুলগুলো ফুটে থাকত রাশিরাশি। স্থানীয় লোকেরা বলে মোমবাতি ফুল। নবশ্বশুরের গলায় হলুদ গাঁদার ফুল দেখে আমার সেই ফুলগুলোর কথা মনে পড়ল। আমার হাতে ঘণ্টা দেড়েক সময় আছে। সন্ধে নামার আগেই আমি গাজলডোবার পথে বেশ খানিকটা চক্কর কেটে আসতে পারতাম, কিন্তু রাস্তার কথা ভেবে চাপ নিলাম না। কিছুক্ষণ বিয়ের মজা দেখে এক কাপ চা খেয়ে টুক টুক করে হাজির হলাম কাছাকাছি বাজারে। গাজলডোবায় ব্যারেজ হওয়ার কারণে এখন বেশ কয়েকটা ছোট বাস জলপাইগুড়ি থেকে এদিক দিয়ে ব্যারেজ পেরিয়ে ওদলাবাড়ি যায়। এনবিএসটিসি-র বাস যায় দিনে দু’-বার। ফলে আগের মতো বিচ্ছিন্নতা আর নেই। জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি যাওয়ার রাস্তাটা পরোক্ষ ভাবে এদিকে অক্সিজেন যোগাচ্ছে। আমি সাইকেল দাঁড় করিয়ে আরেকটা চায়ের দোকানে বসলাম। কলেজের যুগে যে এদিকে যে জনবিরলতা ছিল, সেটা এখন আর নেই। দেবী ভ্রামরীর খ্যাতি বহুদূর বিস্তৃত। ছায়াস্নিগ্ধ, নির্জন অথচ অতি জীর্ণ পথ বেয়ে একটা সাইকেল হঠাৎ এক-আধটা চোখে পড়ত একদা, এখন সে পথে প্রায়ই ছুটে যায় দামী গাড়ি।

কিন্তু পথটা অনেক প্রাচীন। এই বৈকুণ্ঠপুরের গভীরে একদা ছিল বৈকুণ্ঠপুর রাজ্যের রাজধানী। লাগোয়া বনাঞ্চলে শিকারে যেতেন রাজারা। তাই নাম শিকারপুর। তিনদিক নদী আর অরণ্য দিয়ে ঘেরা সেই রাজধানী দুশো বছরেরও আগে কেন জলপাইগুড়ি শহরে আনা হয়েছিল, তা ঠিক জানা যায় না। বহুকাল পর্যন্ত এটাই ছিল রাজ্য আর জলপাইগুড়ি বলে কোনও শহর ছিল না। সেই রাজ্যের এক রানিই হয়ে উঠেছিলেন দেবী চৌধুরানী— সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের কালে বিদ্রোহের নামে গজিয়ে ওঠা ডাকাত দলের বিরুদ্ধে লড়াই-এর জন্য তিনি বানিয়েছিলেন একটা বাহিনী। তাঁর সেনাপতির নাম ছিল রঙ্গলাল।

সাইকেল নিয়ে তাঁর মালিকের বাড়ি ফিরলাম সন্ধের একটু আগে। সেখানে তখন তুমুল গল্প জমেছে। জানা গেল, ছেলে স্বীকার করেছে যে তাঁর মাইনে সাত হাজার। তাই ‘ডিমান্ড’ যদি পঞ্চাশ হাজার হয় তবে বিয়েটা হয়ে যাবে। রাতে মেনু ছিল খাসির মাংস আর ভাত। দেবী চৌধুরানী নিয়ে হরেক সত্যি-মিথ্যে-আজগুবি-বিচিত্র গল্প শুনতে শুনতে খাওয়া হয়েছিল। বুঝতে পারছিলাম যে ভ্রামরী নয়, এলাকার মানুষের কাছে আদরের জিনিস হল দেবী চৌধুরানীর মন্দির। এলাকার আদি বাসিন্দাদের মনের সঙ্গে সে মন্দির জড়িয়ে আছে গভীর ভাবে।

কেউ একজন বলেছিল, ‘চলেন দেখে আসি। বাইকে যাব।’

তখন রাত সাড়ে সাতটার মতো। আমি রাজি হইনি। রাজি হলে সেটাই হত মন্দিরটাকে শেষবারের মতো দেখা। কিছুদিন আগে আগুন লেগে সে মন্দির ছাই হয়ে যাওয়ার সংবাদ যখন সোশাল মিডিয়ায় দেখলাম, তখন সেই নৈশ ভোজনের স্মৃতি মনে পড়ছিল বার বার। পুড়ে যাওয়া শিকারপুরের দেবী চৌধুরানীর মন্দির আমি দেখতে যাইনি। এমন একটা কীর্তি আচমকা পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার সংবাদে অবাকও হইনি। অবহেলা যার ভাগ্য, সে যখন তখন পুড়ে যেতে পারে। শুনছি সে মন্দির আশু পুনর্নির্মিত হবে। প্রাচীন বৈকুণ্ঠপুরের রাজধানী অরণ্যের কোথায় কীভাবে ছিল, এলাকার মানুষ আজ তা জানেন না। ইতিহাসবিদরাও অন্ধকারে। কোচবিহার সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্ব সিংহের ভাই শিষ্য সিংহ যে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, বহুকাল অবধি তা ছিল এক স্বাধীন রাজ্য। তারপর ইতিহাসের নিয়মে সে রাজ্য হয়ে গেছে অবহেলায় পড়ে থাকা কয়েকটি নামগোত্রহীন গ্রাম। সেখানে সাত হাজারি পাত্রের ‘ডিমান্ড’ সত্তর হাজারের নিচে নামেনি।

বিয়েটাও তাই আর হয়নি।

এদিকে গাজলডোবা ওদিকে বেলাকোবা— মাঝখানে পড়ে আছে পর্যটনের চমৎকার সম্ভাবনা। যেমন ধরুন, বেলাকোবার চমচম খেয়ে দেবী চৌধুরানী-ভ্রামরী হয়ে গাজলডোবা। সেখানে বোরলি মাছ সহযোগে মধ্যাহ্ন ভোজন। তারপর তিস্তা পেরিয়ে ওপাড়ে রাত্রিবাসের জন্য রিসর্টের অভাব নেই।

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

স্কেচ: দেবরাজ কর

স্বাগতম

জলপাইগুড়ি পুরবাসীর জন্য উপহার

আমরুত - ১৫১ কোটি টাকা ব্যয়ে তিস্তার জলকে পরিশ্রুত পানীয় জলের উপযোগী করে শহরবাসীকে পরিষেবা দেওয়ার কাজ চলছে।

- কান্তেশ্বরী পার্কের সৌন্দার্যয়ন ও নির্মাণ করা হয়েছে ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে।
- জে ওয়াইএম এ পার্কের সৌন্দার্যয়ন ও নির্মাণ করার কাজ চলছে।

জলপাইগুড়ি পৌরসভা

শ্রীমতী পাপিয়া পাল
উপ-পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

শ্রী মোহন বোস
পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

EKHON DUARS, Vol-4, Issue-19 WBBEN/2014/56733, Rs. 12 Only

ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস

চিত্রকথা 'ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস'। পর্ব-২০। এই চিত্রকথা কোনওভাবেই ছোটদের জন্য নয়। আর কাহিনির সঙ্গে বাস্তবের মিল খুঁজতে যাওয়া অনভিপ্রেত।

কাহিনি : বৈকুণ্ঠ মল্লিক, ছবি : দেবরাজ কর

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 3 Rajdanga Gold Park, Kolkata 700107, Editor - Pradosh Ranjan Saha.